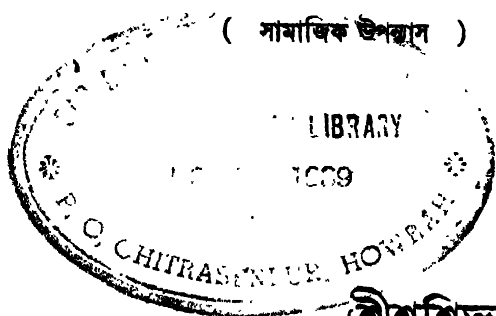
পূজার তত্ত্ব

(সামাজিক উপন্যাস)



শ্রীশশিভূষণ দাস

১ম সংস্করণ সন ১৩৩৫ পৌষ।

পাঁচ সিকা

প্রকাশক—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস।

সৎ-সাহিত্য-মন্দির

৪ দীননাথ মিত্র লেন,

বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় সমূহ

প্রিণ্টার—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস।

আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

স্নেহের

নগেন্‌ !

এই

ক্ষুদ্র

গ্রন্থ

তোমার

কর-কমলে

প্রীতিভরে

অর্পণ

করিলাম।

উপহার।



শ্রীমান জয়দেব মুখোপাধ্যায়

বিবিচন্দ্রপুর

হাওড়া

সন ১৩৫৭

তাং ৯।৬

নিবেদন।

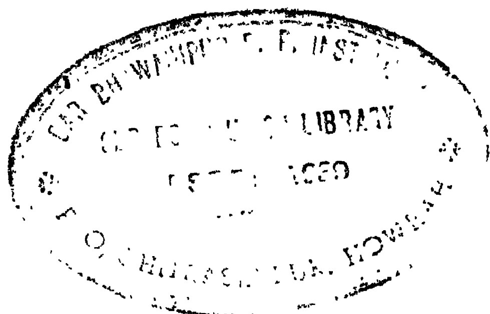
নৈবেদ্য, মাতৃমন্দির প্রভৃতি অনেক পত্রিকায় "পূজার তত্ত্ব" নামক আমার যে ক্ষুদ্র গল্পটী প্রকাশিত হইয়াছিল, অনেকের অনুরোধে সেই গল্পটী বৰ্দ্ধিতাকারে এই উপন্যাস রূপে প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানির নাম পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক অনুরাগী বন্ধু অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে পুস্তকের নামকরণ লেখকের পক্ষে বড়ই সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক লেখক একমাসের মধ্যে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ অনায়াসে লিখিয়া ফেলিতে পারেন কিন্তু পুস্তকের নামকরণ সময়ে ছয়মাসকাল ভাবিয়া অস্থির হইয়াও পুস্তকের উপযুক্ত নাম খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন না। সন্তানের নামকরণ ব্যাপারে যত বিভ্রাট না ঘটে, ততটা বিভ্রাট লেখকের পক্ষে পুস্তকের নামকরণ লইয়া। যাহা হউক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও যখন আমি মনোমত নামকরণে অক্ষম হইলাম, তখন ইহার নাম পরিবর্ত্তনে অনর্থক মাথা ঘামাইবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া পূজার তত্ত্ব নামেই পুস্তক-খানি জন সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। কানা মেয়ের নাম পদ্মপলাশলোচনা রাখিলেই পিতামাতার তৃপ্তি ঘটে বটে কিন্তু অপরে তাহাতে হাস্য করে মাত্র। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে সাহিত্য রথী-মহারথী-গণ উপন্যাসের এমন অদ্ভুত নামকরণ করেন যে পুস্তকের সহিত তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য থাকে না। আমি নবীন সাহিত্যিক নই, কাজেই বর্ত্তমানের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। পূজার তত্ত্বের বিভ্রাট লইয়া এই উপন্যাসের সৃষ্টি, কাজেই সেই নামে পুস্তকের নামকরণ সমীচীন বলিয়া আমি মনে করিলাম—বন্ধুগণ আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

চাঁপাপুকুর }
২৪ পরগণা }

বিনীত
গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী

১।	জ্যোতিঃ	(উপন্যাস)	১॥০
২।	মানের পাহাড়	ঐ	১।০
৩।	ঋণ পরিশোধ	ঐ	১।০
৪।	ভবসুন্দরী	ঐ	১।০
৫।	সোণার প্রতিমা	ঐ	১৸০
৬।	যুগল মিলন	ঐ	২৲
৭।	দিদিমণি	ঐ	২॥০
৮।	সত্যাগ্রহ সংগ্রাম	ঐ	।৵০
৯।	স্বদেশী চাবুক	(১৮ পর্ব্ব)	১।০
১০।	বিসর্জ্জন	(কাব্য)	।৵০
১১।	রেলযাত্রী	(গল্প ও উপন্যাস)	।০
১২।	সমাজ চিত্র	(২০ সংখ্যা)	১।০
১৩।	মডারেটের মতিভ্রম	(গল্প)	৵০
১৪।	বন্দী	(উপন্যাস)	১।০



পূজার তত্ত্ব।

(১)

ছেলের বিয়ের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় যোলআনা হিসাব করিয়া লইয়াও পূজার সময় তত্ত্ব হইল না বলিয়া পটলডাঙ্গার রাজারাম ঘোষের পৌত্রবধূ শ্রীমতী হরসুন্দরী রাগে 'গর গর' করিতে করিতে বৈবাহিকের পিতৃ-পিতামহের অনেক কুৎসা লোক-সমাজে অম্লানবদনে প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। বৈবাহিকের প্রপিতামহ যে চামার ছিল এবং তাহার বংশে যে মুদ্দফরাসের জন্ম হইয়াছে, সহসা অষ্টমী পূজার দিন বেলা সাড়ে আটটার সময়ে হরসুন্দরী তাহা 'গেজেট' করিয়া দিল। পটলডাঙ্গার লোক সেই অভাবনীয় অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব সংবাদ শ্রবণ করিয়া অবাক হইয়া রহিল।

শ্রীমতী হরসুন্দরী রাজারাম ঘোষের পৌত্র, বাঞ্ছারাম ঘোষের পুত্র, অশীতিবর্ষীয় শ্রীমান নফরচন্দ্র ঘোষের তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী। বৃদ্ধ বয়সে

পূজার তত্ত্ব

কায়স্থ-কুল-তিলক নফরচন্দ্র আফিঙ্গের পুরামাত্রা চড়াইয়া দিয়া তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর অঞ্চল ধারণ করিয়া বড় জাহাজের গাধাবোটের মত সর্ব্বদা অন্দর-মহলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হরসুন্দরীর বয়স চল্লিশের অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। বড় মানুষের ঘরের ঘৃত দুগ্ধ ও উপাদেয় খাদ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া শ্রীমতী তাহার গৌরবর্ণ কলেবর খানির পরিপুষ্টি অতিমাত্রায় বজায় রাখিয়াছিল এবং সেই হৃষ্ট-পুষ্ট কলেবরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অলঙ্কার গড়াইতে দশ বিশ ভরি অধিক স্বর্ণের অপব্যয় হইয়া গিয়াছিল। অন্ধের নয়ন, খঞ্জের যষ্টি, ইহকালের সম্বল, ভবপারের ভেলা হরসুন্দরীকে লইয়া শ্রীমান নফরচন্দ্রের শেষ বয়সটা পরম সুখে বিনা গোলযোগে ঝিমাইতে ঝিমাইতে কাটিয়া যাইতেছিল। সহসা অষ্টমীপূজার দিন প্রভাতে যখন হরসুন্দরী বে-আক্কেল বেহাইএর বেয়াদপির কথা নফর-চন্দ্রের কাণে তুলিয়া ঘুমন্ত গৃহস্থের ঘরে ডাকাত পড়ার মত সহসা ঋষভ নিনাদে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন বেচারা নিতান্ত হতভম্বার মত গৃহিণীর নথ-শোভিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখখানার দিকে তাকাইয়া বলিল, তাইত গা! ব্যাপারখানা কি?

গৃহিণী বারান্দার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া দুই একবার ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া যেন হারমনিয়মের 'বেলো' টানিয়া স্বর বাহির করিয়া বেহাগ রাগিনীতে আলাপ করিতে লাগিল, ওগো, আমার প্রকাশ সে দিনের ছেলে—তার কিসের বয়স? সখ্ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম, এখন মান-মর্য্যাদা সব যে যায় দেখ্‌ছি?

কর্ত্তা আলবোলায় তামাক টানিতে টানিতে বলিল, তখনত বলেছিলাম, মৌলিকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়োনা। তা এ বুড়োর কথাত কেউ শুনবে না? এখন এ হ'ল কি বলত?

সেতারে ঝঙ্কার তুলিয়া গৃহিণী বলিল, হ'বে আর কি? ছোটলোক দত্তের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে যা হ'বার তাই হচ্ছে। চামারের বংশে মুদ্দফরাস জন্মেছে, ব্যবহারটাও সেই রকম করেছে।

কর্ত্তা ঝিমাইতে ঝিমাইতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বিয়ের সময় পাওনাটা কিন্তু নেহাত মন্দ হয় নি।

গরম তেলে কই মাছ ভাজার মত লাফাইয়া উঠিয়া গৃহিণী বলিল, রেখে দাও তোমার বিয়ের পাওনা। তত্ত্ব-তাবাসের পাওনাইত আসল পাওনা—যেমন প্রজার কাছে খাজনার উপর উপরি পাওনা আদায়। গুরুঠাকুরের বার্ষিক বন্ধ করে' জামাইএর বাড়ী তত্ত্ব পাঠাতে হয়, ছোটলোক তার খবর রাখে না?

ঠিক সেই সময়ে পোদ্দার বউ, যিনি পটলডাঙ্গা অঞ্চলের রয়টারের টেলিগ্রাম—লোকের ঘরের হাঁড়ির খবর যিনি কটাক্ষমধ্যে সহরময় রাষ্ট্র করিয়া থাকেন, তিনি স্বীয় বিশাল বপু বহন করিয়া মাতঙ্গিনী-গমনে মেদিনী কম্পিত করিয়া সশরীরে ঘোষ-গৃহিণীর সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। ঘোষ-গৃহিণী হরসুন্দরীর মুখখানা তখন ঠিক যেন আগুনে পোড়া ভীমরুলের চাকের মত। পোদ্দার বউকে দেখিয়া হরসুন্দরী পোড়ামুখ নীচু করিয়া রাখিল।

পোদ্দার বউ বলিল, দেখে এলাম বোসেদের বাড়ী পূজার তত্ত্ব এসেছে। হ্যাঁ—দেখ্‌বার মত তত্ত্ব বটে! বিশজন ভারীর কাঁধে হাজার রকমের জিনিস—ঘরে রাখ্‌বার স্থান কুলাচ্ছে না। বোস-গিন্নির বুকের পাটা আজ দেখে কে? বড় ঘরে কাজ করেছে বটে!

আর যাবে কোথায়? ধূনার গন্ধে মনসা-কালী নাচিয়া উঠিল। একে বোসেদের সঙ্গে চিরকালের বিবাদ। তাহার উপরে পূজার তত্ত্বে

'টেক্কা' দিয়া তাহারা আজ মুখ ঝলসাইয়া দিল। গৃহিণী হরসুন্দরী রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চীৎকারে পাড়া মাতাইয়া তুলিল। বোসেদের বাড়ীর তত্ত্বের কথা শুনিয়া ঈর্ষায় বুকের মাঝে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। নূতন বেহাইকে সবংশে নিপাত যাইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া হরসুন্দরী গোক্ষুরা সাপের মত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

---

(২)

ঘোষেদের আর বোসেদের বাড়ী পাশাপাশি। অপরাহ্ণে পাশের বাড়ীর বোস-গিন্নী ছাদের উপর উঠিয়া ঘোষেদের বাড়ীর ক্ষ্যান্ত চাকরাণীকে ডাকিয়া বলিল, ক্ষ্যান্ত! ঘোষ-গিন্নী আজ ডুমুরের ফুল হ'ল নাকি—একটীবারও ছাদে উঠ্‌লো না যে! সমস্ত দিন ধরে' বেহাইএর বাড়ীর পূজার তত্ত্ব গুছিয়ে ঘরে তুল্‌ছে বুঝি?

ক্ষ্যান্ত দাসী ব্যঙ্গ বুঝিল—মনে মনে তাহার বড় রাগ হইল কিন্তু তাহার মত ঝি-চাকরাণী বড় ঘরের গিন্নীর মুখের উপর সমান উত্তর দিলে দোষের হইবে ভাবিয়া মনের গরম চাপিয়া রাখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুক্‌নো কাপড় গোছাইতে লাগিল। সে কোন উত্তর দিল না বটে, কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধে তাহার কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনি বাহির হইল।

বোস-গিন্নী হাসিয়া বলিল, কিরে! তত্ত্বের ঢেকুর তুল্‌ছিস্‌ নাকি?

এবার ক্ষ্যান্ত রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া বোস-গিন্নীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, পরের বাড়ীর তত্ত্বের 'পিত্যেশে' সম্বৎসর আমাদের হা করে' বসে থাক্‌তে হয় না মা! আমরা রোজই এমনি ঢেকুর তুলে থাকি।

বোস-গিন্নীর অন্তরে খোঁচা লাগিল—চাকরাণীর মুখে এমন উত্তর শুনিয়া রুষ্ট হইয়া বোস-গিন্নী বলিল, ক্ষ্যান্তি! আমরাই বুঝি তত্ত্বের আশায় হা করে' বসেছিলাম?

ক্ষ্যান্ত বলিল, তা যদি না থাক্‌বেন, তবে এমন ঢাক বাজিয়ে লোক জানাজানি কর্‌ছেন কেন? আজ কাল ছোটলোকের ঘরেও পূজার সময় তত্ত্ব এসে থাকে।

বোস-গিন্নী রোষভরে বলিল, বটে! তোর ছোট মুখে এত বড় কথা! আমরাও কি ছোটলোকের দলে?

ক্ষ্যান্ত বলিল, কারো গায়ে ছোট লোক ভদ্রলোকের 'ছাপ' দেওয়া থাকে না। আপনি ভদ্রঘরের গিন্নী—আমি ছোটলোক চাকরাণী। আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রুপ আরম্ভ করে' দিয়েছেন, আপনার ভদ্রতা কেমন?

ঠিক সেই সময় রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে ছাদের উপর দেখা দিল, শ্রীমতী হরসুন্দরী। বোসী-গিন্নীর সব কথা তাহার কানে গিয়াছিল—আগুন-ভরা বোমার মত উপরে উঠিয়া আসিয়া হরসুন্দরী গর্জ্জন করিয়া বলিল, বোস-গিন্নি! তোমরা কি ভদ্রলোক?

ঘোষ-গিন্নীকে কোন্দলে পরাজয় করা বোস-গিন্নীর সাধ্যাতীত বেগতিক দেখিয়া পলায়নোদ্যত হইয়া বোস-গিন্নী বলিল, আমর

ভদ্রলোক হ'ব কি করে'? আমরা ত চামার কসাইএর সঙ্গে কুটুম্বিতে করিনি?

ঘোষ-গিন্নী নিজ মুখে নিজের কুটুম্বকে চামার কসাই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, বোস-গিন্নী সেই কথার খোঁচা দিয়া ছাদ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। হরসুন্দরী নিজের কথায় নিজে ঠকিয়া বেয়াকুবের মত মুখভার করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

হরসুন্দরী নফরচন্দ্রের কাছে গিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, এমন ছোটলোকের বাড়ীর পাশে তোমার বাপ ঠাকুরদা বাড়ী করেছিলেন?

কাল বৈশাখী মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া নফরচন্দ্র ভীতভাবে বিজড়িতস্বরে বলিল, কেন, হয়েছে কি?

হরসুন্দরী বলিল, হ'বে আর কি? বোস-গিন্নী ছোট মুখে বড় কথা শুনিয়ে গেল। এক হতভাগার সঙ্গে কুটুম্বিতা করে' বসেছ। পূজার সময় মান রাখ্লে না, এখন লোকের কাছে মুখনাড়া সইতে হচ্ছে। ইচ্ছা করে, গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

যথার্থই যদি গিন্নী গলায় একটা ফাঁসি লাগাইয়া দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে নফরচন্দ্রের উপায়! আশী বছর বয়সে আর ত চতুর্থ-পক্ষের আশা নাই। মহাভীতভাবে নফরচন্দ্র বলিল, য়্যাঁ—বল কি! তুমি গলায় দড়ি দেবে? না—না—অমন কর্ম্ম করো না গিন্নি! তাহ'লে আমি হাফিয়ে মারা যাব। বলিয়াই নফরচন্দ্র হরসুন্দরীর হাত ধরিল। ভঙ্গি দেখিয়া হরসুন্দরী সবলে হাত টানিয়া লইয়া বলিল, মরণ আর কি! ধাক্কা খাইয়া নফরচন্দ্র গৃহিণীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

পূজার তত্ত্ব

জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ নফরচন্দ্রের হাত ধরিয়া তুলিয়া হরসুন্দরী স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইল। অমনি বৃদ্ধের মুখে গালপোরা হাসি বাহির হইল। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, বেঁচে থাক—বেঁচে থাক—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমার এক শ বছর পরমায়ু হ'ক।

ঠিক সেই সময় নফরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুকূল চন্দ্র একখানি পত্রিকা হস্তে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল।

---

(৩)

হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, কোথার পত্র ?

অনুকুল বলিল, মা! প্রকাশের শাশুড়ীর কঠিন ব্যারাম হয়েছে, জীবন-সঙ্কট অবস্থা। সিমলা থেকে পত্র এসেছে। সেইজন্য প্রকাশের শ্বশুর পূজার তত্ত্ব করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন, তত্ত্বের পাওনাটা পরে কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবেন।

বিকৃতকণ্ঠে রুষ্টস্বরে হরসুন্দরী বলিল, ও সব সেয়ানামি কার কাছে ? পূজোর সময় তত্ত্ব পাঠালে না—পরে কি আমার শ্রাদ্ধের তত্ত্ব পাঠাবে ? ছোট লোক জানে না, বড় ঘরে কাজ করলে বড় রকম খরচ করতে হয় ?

বিরক্তভাবে অনুকুল বলিল, হ্যাঁ মা! বিপদে পড়ে তত্ত্বটা করে' উঠ্‌তে পারেন নি বলে' তুমি কুটুম্বকে এত গালিগালাজ করছ ?

ক্রোধভরে হরসুন্দরী বলিল, কেন গাল দেব না—এক শ বার দেব, সে ছোটলোক, তার চোদ্দ পুরুষ ছোটলোক।

অনুকুল বলিল, নিজের কুটুম্বকে নিজে ছোটলোক বলছ, আর পরের কাছে তারই 'খোঁটা' খেয়ে মরছ। এইমাত্র বোস-গিন্নী তোমাকে কি উত্তরটা দিয়ে গেল, শুনে লজ্জা হ'ল না ? ছিঃ!

পূজার তত্ত্ব

বেহাইএর বিপদের কথা শুনিয়া কর্ত্তা সহানুভূতির স্বরে বলিল, তাইত! বেহাইএর বড় বিপদ দেখ্ছি! ছোট খাটো বিপদ নয়— বেহানের অসুখ। যদি তেমন কিছু ঘটে, সর্ব্বনাশ হ'বে যে! গৃহশূন্য হওয়া যে কি দায়, তা যে আমি দু'বার ভুগে বুঝ্তে পেরেছি। আহা! বেহাইএর বড় বিপদ গো বড় বিপদ!

হরসুন্দরী চোখ রাঙ্গাইয়া ধমক দিয়া বলিল, কিসের বিপদ! বাড়ী শুদ্ধ মরে' উজাড় হ'য়ে যা'ক না কেন, তবু তত্ত্বের ভুল হ'বে?

অনুকুল বলিল, বল কি মা! দায়ে পড়ে কি লোকের দোষ ঘাট হয় না? আমাদের বোন পুঁটুর ত সে দিন বিয়ে দিয়েছ? এবার পূজোর সময় কতটা তত্ত্ব করেছ, বলত?

অন্তরে একটা খোঁচা খাইয়া দুই একটা ঢোক গিলিয়া হরসুন্দরী বলিল, যদি না করে' থাকি, হয়েছে কি?

অনুকুল বলিল, তারা যদি এমনিভাবে আমাদের গাল দেয়?

পুঁটু নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, না বড়দা! আমার শ্বশুর তেমন অভদ্র লোক নন্। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কাঠালের তত্ত্ব হয়নি কিন্তু তিনি একটুও গাল-গালাজ করেন নি। শুদ্ধ তিনি আমার শ্বাশুড়ীকে বলেছিলেন, বেহান্ আমার মেদিনীপুরের মেয়ে— উড়ের দেশের নিকটে বাস, তত্ত্ব-তাবাস কি করে' কর্তে হয়, ভাল করে' শেখেন নি। ভদ্রতা শিখ্তে এখনও ঢের দেরী।

অনুকুল মৃদুহাস্য করিয়া মুখ নীচু করিল। সে হাসি দেখিয়া হরসুন্দরীর গা জ্বলিয়া উঠিল। রাগে অগ্নি-অবতার হইয়া হরসুন্দরী কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, গাল দেবে তাদের সাধ্য কি? জানিস্, আমার ঘরের মেয়ে নিয়ে তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়েছে? আমরা কি ছোটলোক দাস, দত্ত?

অমনি অনুকূল বলিল, তুমি ত মা! হাঁসখালির দত্তদের ঘরের মেয়ে। তোমাকে ঘরে এনে আমার ঠাকুরদাদার কত পুরুষ উদ্ধার হয়েছে?

পিতার কুলে আঘাত পড়াতে হরসুন্দরীর কণ্ঠস্বর পঞ্চম হইতে কড়িমধ্যমে নামিয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই সপ্তমে স্বর চড়াইয়া গৃহিণী বলিল, অনু! তোদের ভাগ্য ভাল, তাই হাঁসখালির দত্তদের মাতুল পেয়েছিলি?

অনুকূল বলিল, কেন মা! দাস দত্ত হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠ্‌লো কি করে'?

হরসুন্দরী বলিল, ওরে তাদের আঁটি ঘাট বাঁধা। কত ঘোস বোস মিত্তির তাদের আস্তাকুড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

অনুকূল বলিল, বটে! শুনেছি, হাঁসখালির দত্তরা নাকি জেলে পাটনীর বংশ।

প্রবাদ বা অপবাদ আছে, হাঁসখালির দত্তদের কোন পূর্ব্বপুরুষ মাছের ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন। অনুকূলের মুখের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে হরসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাগেশ্রী আলাপ করিয়া বলিল, পাজি! নচ্ছার! তোর ছোট মুখে বড় কথা?

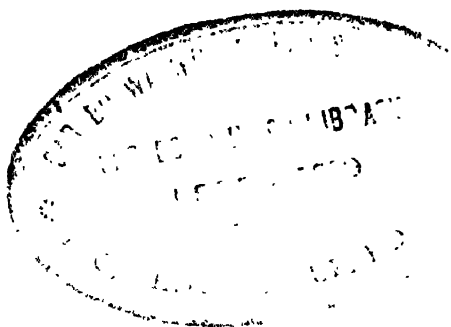
মাথা নীচু করিয়া অনুকূল বলিল, সত্যি কথা বল্‌লে, রাগ কর কেন? তোমার পিতৃকুলে এ অপবাদ নাই মা?

দুনিয়ায় হরসুন্দরীকে সকলেই ভয় করিয়া চলিত, কেবল এই পেটের ছেলে অনুকূলচন্দ্রই মাঝে মাঝে তাহার উপর দৌরাত্ম্য করিত। পুত্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া নফরচন্দ্র বলিল, অনুকূল! অপবাদ

সত্যই হ'ক, আর মিথ্যাই হ'ক, গর্ভধারিণীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি কোন ভদ্র-সন্তানের কর্‌তে নাই, তা তুমি জান ?

পিতা রুষ্ট হইয়াছেন, কাজেই আর কথা বলা উচিত নয় ভাবিয়া অনুকূলচন্দ্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। হরসুন্দরী অনেকক্ষণ বকাবকি করিল। চীৎকারে যখন গলা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাহার স্বর নরম হইয়া আসিল। হরসুন্দরী শেষে মীমাংসা করিল, বউ বেটী আগে ঘরে আসুক, এর শোধ নিয়ে ছাড়্‌বো।

বাধ্য হইয়া কর্ত্তাকেও গৃহিণীর সেই এক তরফা মীমাংসায় গোঁজামিল দিতে হইল।



(৪)

প্রকাশচন্দ্রের শ্বশুর হেমবাবু সিমলা পাহাড়ে বড়লাটের আফিসে হোম ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করেন। গত বৈশাখ মাসে তিনি ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়া চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পটলডাঙ্গায় 'বড়ঘরে' আদরের কন্যা শৈবলিনীর বিবাহ দিয়াছেন। কন্যার বিবাহের পর যথাসময়ে সপরিবারে তিনি সিমলায় ফিরিয়া গেলেন।

হঠাৎ হেমবাবুর স্ত্রী সুরবালা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। প্রথমে তাহার বুকে সর্দ্দি লাগে—সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া অত্যাচার করিল। রোগ, ঋণ আর আগুন যত সামান্যই হ'ক না কেন, প্রথমে অগ্রাহ্য করিলে পরিনামে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। অত্যাচারের ফলে সেই সামান্য সর্দ্দি বুক জুড়িয়া বসিল—ফুস্ ফুস্ আক্রান্ত হইল। বিজ্ঞ চিকীৎসক বুক পরীক্ষা ক'রিয়া মুখভার করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মার লক্ষণ। হেমবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কন্যার বিবাহে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে—সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া গিয়াছে—কিছু ঋণও হইয়াছে। পত্নী সুরবালার যে অসুখ, তাহাতে প্রচুর

অর্থ ব্যয় প্রয়োজন। সিমলা পাহাড় স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও ডাক্তারে ব্যবস্থা করিল, আলমোরা কিম্বা কাশ্মীর প্রদেশে রোগীকে সত্বর স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। হেমবাবু ভাবিয়া অস্থির হইলেন, কি প্রকারে পত্নীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন। পরাধীন চাকরী, কন্যার বিবাহে একবার ছুটী লইয়াছেন। আবশ্যক হইলে যদিও পুনরায় দুই এক মাস ছুটী লইতে পারেন কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই যে তাঁহার পত্নী দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিবে, তাহারই বা স্থিরতা কি ?

হেমবাবু বড় বিপন্ন হইলেন। পত্নী সুরবালা তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল, তুমি ভেবো না—আমাকে স্থানান্তরিত কর্‌তে হ'বে না। এইখানে ঔষধ খেয়ে ভাল হ'য়ে যাব।

সুরবালার মনের উদ্দেশ্য কি, তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। সুরবালা বুঝিয়াছিল, তাহাকে কাল-রোগে ধরিয়াছে, নিস্তার পাইবার কোন উপায় নাই। তাহার সুচিকীৎসার জন্য ব্যস্ত হইলে স্বামীকে অর্থাভাবে বিপন্ন হইতে হইবে—রোগ সারিতে কিম্বা তাহার মৃত্যু ঘটিতে বিলম্ব হইলে হয়ত তাঁহার চাকরী যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। শেষে কি স্বামীকে ধনে প্রাণে মজাইয়া পথের ভিখারী করিয়া যাইবে ? তাহাই সুরবালা জেদ করিয়া বসিল, সিমলার পাহাড় ছাড়িয়া সে এক পাও নড়িবে না।

হেমবাবু বলিলেন, অন্যায় জেদ কর্‌ছ কেন সুরবালা ?

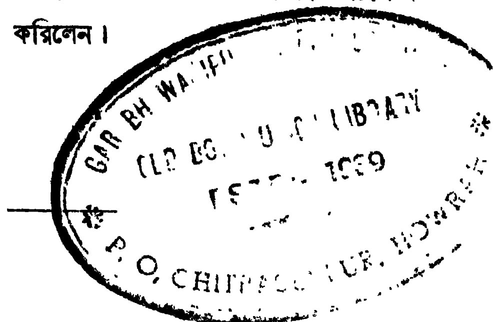
সুরবালা বলিল, অন্যায় নয়, আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, আমাকে কালে ধরেছে, আমার অব্যাহতি নাই। তবে অনর্থক অর্থ ব্যয় করে' কেন সর্ব্বস্বান্ত হ'বে ?

হেমবাবু বলিলেন, যদি তুমি চলে যাও, আমার সর্ব্বস্বান্তের বাকি কি থাক্‌বে? বরং 'যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ তল্লাস', শ্লেষ্মারোগে কি লোক বাঁচে না? ডাক্তার সাহেব বলেছেন, এখনও আশা আছে।

সুরবালা বলিল, ডাক্তার সাহেব তোমাকে যতই ভরসা দিন না কেন, আমার শরীরের অবস্থা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার নিস্তার নাই। তুমি বুক বাঁধ।

সুরবালা যাহাই বলুক, হেমবাবু কিন্তু বুক বাঁধিতে পারিলেন না। রোগিনীর মনের এ দুর্ব্বলতা তিনি রোগেরই একটা লক্ষণ ভাবিয়া লইলেন। কাজেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, সুরবালা যতই আপত্তি করুক না কেন, তাহার সুচিকীৎসার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, নতুবা তাঁহার কর্ত্তব্য হানি হইবে।

তাঁহার কতকগুলি পুত্র-কন্যা। শৈবলিনী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা—তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ। সে বিবাহিতা হইয়াছে, দুদিন পরে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। যদি সুরবালার কোন অমঙ্গল ঘটে, তিনি নাবালক পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া কি প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন? সুরবালার সহস্র আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া তিনি দুই মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলেন—ছুটী মঞ্জুর হইয়া গেল। এক মাসের বেতন পাইয়া ও ঋণ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি ডাক্তারের উপদেশ মত সপরিবারে আলমোরায় যাত্রা করিলেন।



(৫)

যে আলমোরায় গেলে মরা রোগী বাঁচিয়া যায়, সেই আলমোরায় উপস্থিত হইয়া সুরবালার রোগ আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বে সুরবালা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিত, এখানে আসিয়াই একেবারে শয্যাগত হইল। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হেমবাবুর আশা ভরসা সব গেল কিন্তু তবুও তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন না। ঝড়ে নৌকা দরিয়ার বুকে ডুবিতে বসিয়াছে, তবুও জোর করিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন, যদি তুফানের বুক ভাঙ্গিয়া একটা ঢেউ আসিয়া তরী কুলে তুলিয়া দিয়া যায়। তিনি মনস্থ করিলেন, আলমোরা ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে যাইতে হইবে।

তিনি মনস্থ করিলেন বটে কিন্তু আর অর্থ নাই। সুরবালা বলিল, আর কেন, ঢের হয়েছে। তোমার ছুটীও ফুরিয়ে এসেছে—আমার দিনও নিকট হয়েছে। চল, সিমলায় ফিরে যাই। হেমবাবু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই

বন্ধু-বান্ধবহীন অপরিচিত স্থানে অর্থ পাইবেন কোথায়? তিনি চিন্তিত হইলেন। তখনও তিনি আশা করিয়াছিলেন, হয়ত কাশ্মীরে গেলে সুফল ফলিতে পারে।

শঙ্কর নামে হেমবাবুর এক বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। ষোল বৎসর পূর্ব্বে হেমবাবু যখন প্রথম চাকরী পাইয়া সপরিবারে সিমলায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি পথে রেল-ষ্টেশনে এই ভৃত্যটাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। ত্রিসংসারে শঙ্করের কেহ ছিল না। রুগ্ন অবস্থায় সে ষ্টেশনে পড়িয়াছিল—লোকের কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিয়া সে দিন কাটাইতেছিল। তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া হেমবাবুর স্ত্রী সুরবালার দয়া হইল। তাহাকে সিমলার পাহাড়ে আনিয়া চিকীৎসা করাইতে রোগ ভাল হইয়া গেল। সেই অবধি সে হেমবাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া মাসিক দশ টাকা বেতনে ভৃত্যের কার্য্য করিতে লাগিল।

শঙ্কর পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী—বর্ত্তমানে তাহার বয়স চল্লিশের উপর। সে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ট। সুরবালাকে সে মা বলিয়া ডাকিত। সুরবালার পুত্র-কন্যাদের সে কাঁধে পিঠে করিয়া মানুষ করিত। সুরবালাকে আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া কৃতজ্ঞ প্রভুভক্ত শঙ্করের বুক ফাটিয়া গেল। আলমোরায় আসিয়াও যখন সুরবালার রোগের প্রতিকার হইল না, তখন শঙ্কর চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। সুরবালাকে কাশ্মীরে লইয়া যাইবার জন্য যখন হেমবাবু আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সক্ষম হইতেছিলেন না, তখন শঙ্কর ধীরপদে হেমবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, কাশ্মীরে গেলে মা আমার ভাল হ'বেন?

হেমবাবু কাতর দৃষ্টিতে শঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, শেষ চেষ্টা করে' দেখা আমার কর্ত্তব্য কিন্তু আমার যে অর্থ নাই শঙ্কর ?

শঙ্কর বস্ত্রমধ্য হইতে একটা টাকার থলে বাহির করিয়া হেমবাবুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, বাবু! টাকার ভাবনা নাই, আপনি আমার মাকে ভাল করুন। শঙ্কর বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

হেমবাবু বিস্মিতভাবে শঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শঙ্কর পুনরায় বলিল, একদিন আমি মর্‌তে বসেছিলাম, মা আমাকে কত যত্নে সেবা করে' বাঁচিয়েছিলেন। আমার এতকালের সঞ্চিত অর্থ আজ আমি মার সেবায় ব্যয় করে' ঋণ পরিশোধ কর্‌বো বাবু!

হেমবাবুর দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অদূরে রোগ শয্যায় শায়িতা সুরবালার চক্ষু হইতেও অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সুরবালা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, শঙ্কর! শঙ্কর!

শৈবলিনী নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল—ছুটিয়া গিয়া শঙ্করের হাত ধরিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে বলিল, শঙ্কর দা! তুমি যথার্থই আমাদের বড় ভাই!

শঙ্কর বলিল, দুনিয়ায় আমার কেউ নাই। তোমরাই আমার যথাসর্ব্বস্ব। আজ যদি মা আমাদের ত্যাগ করে' চলে যান, আমরা কোথায় ভেসে যাব দিদি!

সুরবালা বলিল, শঙ্কর! অনর্থক অর্থ ব্যয় করো না বাবা! বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমি বাঁচ্‌বো না। টাকাগুলো রেখে দাও, তোমার ত একটা পরিণামের চিন্তা আছে?

শঙ্কর বলিল, যদি নাই বাঁচ, আমাদের আপ্‌শোষ থাকে কেন, একবার শেষ চেষ্টাটা করে' দেখা যা'ক।

অবিলম্বে হেমবাবু আলমোরা হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। হ্রদের ধারে একটা 'বাংলো' ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। স্থানের গুণে প্রথমে রোগিনী অনেকটা উপকার বোধ করিল কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিল। এত অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কিছুই ফল হইল না। হেমবাবু পরিণাম বুঝিতে পারিলেন। হতাশ হইয়া তিনি সপরিবারে পুনরায় সিমলায় চলিয়া আসিলেন।

সুরবালার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—হেমবাবু কপর্দ্দক শূন্য হইয়াছেন। ঠিক সেই সময় দুর্গাপূজা উপস্থিত। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, সম্প্রতি শৈবলিনীর বিবাহ হইয়াছে, তাহার শ্বশুরবাড়ী পূজার তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে—না পাঠাইলে বড় ঘরের মর্য্যাদা-হানি হইবে। কিন্তু উপায় কি? প্রতি মূহূর্ত্তে সুরবালার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, তাহার উপর দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিপদে পড়িয়া কৃতজ্ঞ প্রভুভক্ত ভৃত্য শঙ্করের সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইতেছে। কাজেই নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া তিনি ত্রুটি স্বীকার করিয়া পটলডাঙ্গার বৈবাহিককে পত্র প্রদান করিলেন। নিজের বিপদের কথা জানাইয়া পরমাত্মীয়ের কাছে সহানুভূতি পাইলেন না, পটলডাঙ্গার ঘোষেরা একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়াও তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের সংবাদ লইল না। হেমবাবুর মনোকষ্টের অবধি রহিল না।

(৬)

কন্যা শৈবলিনী দিবারাত্র মুমূর্ষু জননীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে লাগিল। ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলির মুখের দিকে তাকাইতে আর কেহ নাই। হেমবাবু পুনরায় চাকরীতে যোগদান করিয়াছেন, কাজেই বালিকা হইলেও শৈবলিনীই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। শঙ্কর চাকর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সংসারের সব কাজ করিতেছে, ছেলেমেয়েরা দুষ্টামি করিলে তাহাদের চোখ রাঙ্গাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছে, আবার তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া উঠিলে সস্নেহে তাহাদের বুকে তুলিয়া লইয়া চোখের জলে নিজের বুক ভাসাইতেছে।

সুরবালা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, শৈবলিনি! মা আমার, এত অল্প বয়সে তুই এমন সেবা কর্‌তেও শিখেছিস্? রোগের যাতনা আমি একটুও বুঝ্‌তে পারি নে। মা! দেবতার মত স্বামী, তোমার মত কন্যা, শঙ্করের মত ভৃত্য যার আছে, মরণেও তার দুঃখ নাই। কেবল দুঃখ হচ্ছে অই অপগণ্ডগুলোর জন্য। তুমি শ্বশুর ঘরে চলে গেলে কে ওদের মানুষ কর্‌বে? সুরবালার কোটরাগত চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

শৈবলিনী নিজের চোখের জল মুছিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে জননীর চোখের জল মুছাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে শঙ্কর চাকর বালক বালিকাদের লইয়া পাহাড়ের উপর বেড়াইতে গিয়াছিল। এই সময় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। একটী বালক তাহার স্কন্ধে, একটী বালিকা তাহার কক্ষে, অপর বালকের হাত ধরিয়া সে ধীরপদে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। শঙ্কর িজের অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের খাবার কিনিয়া দিয়াছিল, তাহারা মনের আনন্দে খাইতেছিল।

সে দৃশ্য দেখিয়া সুরবালা অবাক হইয়া রহিল। শৈবলিনী বলিল, শঙ্কর দা! ওরা ত বড হয়েছে, চল্‌তে পারে। তবে কেন তুমি ওদের ঘাড়ে পিঠে করে' ব'য়ে বেড়াও?

শঙ্কর বালক বালিকাদের নামাইয়া দিয়া বলিল, তোদের ঘাড়ে পিঠে করে' ব'য়ে বেড়াবার জন্যই যে ভগবান আমাকে সংসাকে পাঠিয়েছেন। তুই ভুলে গেলি দিদি! আমার কাঁধে পিঠে চড়ে ত তুই এত বড়টা হয়েছিস।

শৈবলিনীর লজ্জা হইল। সে পিতামাতার প্রথম সন্তান—শঙ্কর চাকর তাহাকে যত কোলে পিঠে করিয়াছে, আর কাহাকেও তত করে নাই। অপর ভাই ভগিনীগুলি যদি সে অধিকার পায়, তাহার ত ঈর্ষা করা উচিত নয়! কিন্তু শৈবলিনী ঈর্ষাভরে কথাগুলি বলে নাই। শঙ্করের ত্যাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় শৈবলিনীর হৃদয় তাহার উপর শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়াছে। শঙ্করকে সে আজ সামান্য ভৃত্য মনে করিতে পারে না—সে যেন তাহাদের পরমাত্মীয়। শৈবলিনী বলিল, শঙ্কর দা! মার অসুখ—আমি দিনরাত্রি মার সেবা কর্‌ছি। সংসারের সব কাজ এখন তোমাকে কর্‌তে হয়।

তুমি দাদা! অবসর মত একটু আধটু বিশ্রাম করো, নয়ত শরীর ভাল থাক্‌বে কেন?

শঙ্কর বলিল, বড় দরদী বোন্ হয়েছিস্ যে! আমার ছোট ছোট ভাই বোন্‌গুলোর যদি কষ্ট হ'ল, তবে আমার শরীর ভাল থেকেই বা লাভ কি? শৈবি! তোকে কোন চিন্তা করতে হ'বে না, আমি ওদের নিয়ে বেশ আছি।

যথার্থই শঙ্কর ছেলেমেয়েদের ভালবাসিত—তাহাদের যত্ন করিত কিন্তু তাহার একটা দোষ ছিল, সে তাহাদের দুষ্টামি আদৌ বরদাস্ত করিতে পারিত না। যখনই তাহারা দুরন্তপণা করিত, শঙ্কর চোখ রাঙ্গাইয়া তাহাদের পেটের 'পিলে' চম্‌কাইয়া দিত অথবা গণ্ডে এমন চপেটাঘাত বসাইয়া দিত যে পাঁচ মিনিট কাল হা করিয়া তাহারা চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিত। পরক্ষণে শঙ্কর নিজেই সন্দেশ রসগোল্লা কিনিয়া আনিয়া আবার তাহাদের হা বুজাইয়া দিত।

সুখে দুঃখে এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। তাহার পর, একদিন সুরবালা পুত্র-কন্যাগণকে অকালে মাতৃহীন করিয়া স্বামীকে অনন্ত শোক-সাগরে ডুবাইয়া শঙ্কর চাকরের বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিল। হেমবাবু কাঁদিয়া আকুল হইলেন—শৈবলিনী পাগলিনীর মত হইল—আর শঙ্কর চাকর ছোট ছেলে মেয়েদের বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া বালকের মত রোদন করিতে লাগিল।

অবিলম্বে বন্ধু বান্ধবেরা আসিয়া মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে লইয়া গেল। পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ঝরণার ধারে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর চাকর ছেলেমেয়েদের বুকে করিয়া দূরে বসিয়া সেই

চিতার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, মার সোনার অঙ্গ এমনি করে' চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। মা আমার কোন্ স্বর্গরাজ্যে চলে গেল। পড়ে র'ল, মার এত সাধের সাজানো সংসার। সে সংসারও যে আজ শ্মশান হ'য়ে যায়! মাগো! সোনার রথে উঠে স্বর্গরাজ্যে চলে যাচ্ছ, একবার আমাদের দিকে ফিরে চাও।

ক্রমে চিতা নিভিয়া গেল। শঙ্কর ঝরণার জলে ছেলে মেয়েদের স্নান করাইয়া তাহাদের কোলে পিঠে লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল। শৈবলিনী তখন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল। হেমবাবু তাহার পার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে গিয়া নিজেই চোখের জলে বুক ভাসাইতে ছিলেন।

---

(৭)

পত্নীর শ্রাদ্ধ .শান্তির জন্য পুনরায় কিছুদিনের ছুটী লইয়া হেমবাবু সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। ভবানীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাস-ভবন ছিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া সহানুভূতি দেখাইল—অনেক আহা উহু করিল, কেবল আসিল না, পটলডাঙ্গার বড় ঘরের পরমাত্মীয় ঘোষেরা। একদিন হেমবাবু নিজে তাহাদের দ্বারস্থ হইলেন, তাঁহার ত্রুটির জন্য বৈবাহিকের হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন কিন্তু তবুও বড় ঘরের মনের গরম মিটিল না। শ্রাদ্ধের সময় নিমন্ত্রণ হইল কিন্তু সে নিমন্ত্রণ রাজারাম ঘোষের পৌত্রবধূ হরসুন্দরীর গ্রাহ্য হইল না—ঘোষ পরিবারের একটী প্রাণীও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল না।

একে পত্নীশোকে হেমবাবু কাতর হইয়াছেন, পটলডাঙ্গার ঘোষেদের দুর্ব্যবহারে তিনি আরও মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রাদ্ধান্তে তিনি পুনরায় কর্ম্মস্থলে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় পটলডাঙ্গার ঘোষেদের বাটী হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার কন্যাকে

শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইবে। হেমবাবুর ইচ্ছা ছিল, শৈবলিনীকে পুনরায় সঙ্গে লইয়া সিমলায় যাইবেন। সংসারে আর কোন বয়স্থা স্ত্রীলোক নাই—চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। শৈবলিনী এখন তাঁহার ছেলে মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে—তাঁহার দুই বছরের শিশু পুত্রটী শৈবলিনীর গলার হার হইয়া পড়িয়াছে। শৈবলিনী কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে থাকিলে অনেক সুবিধা হইবে, এই ভাবিয়া কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে প্রথমে আপত্তি করিলেন। অমনি পটলডাঙ্গার অঞ্চল হইতে জোর তলপ আসিল, পাঠাইবে কি না, স্পষ্ট জানাইবে।

হেমবাবুর হৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—তিনিও যেন চোখ রাঙ্গাইয়া উত্তর দিতে প্রস্তুত হইলেন, যদি না পাঠাই! কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংবরণ করিলেন। কন্যাকে যখন পরের ঘরে দিয়াছেন, তখন আর ত তাহার উপর কোন দাবী দাওয়া চলিতে পারে না। তিনি বুঝিয়াছেন, পটলডাঙ্গার পরমাত্মীয়দের যেমন প্রবৃত্তি, তাহাতে তাহারা হয়ত কেলেঙ্কারী ঘটাইতে পারে। এমন কি, হয়ত তাহাদের পুত্রের বিবাহ অন্য স্থানে দিয়া বসিতে পারে। কাজেই কন্যার কল্যাণ কামনায় তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

শৈবলিনী বসন ভূষণ পরিধান করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল—ছোট ছোট ভাই বোন্‌গুলি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশু ভাইটী তাহার কোলে উঠিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। শৈবলিনীর বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার

উপক্রম করিল। শিশুর মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে নামাইতে গেল, সে কিছুতেই নামিতে চাহে না, তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া 'দিদি' 'দিদি' বলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিকটে দাঁড়াইয়া হেমবাবু সে দৃশ্য চোখে দেখিলেন, বুকে যেন কামানের গোলার আঘাত লাগিল। তিনি হাত বাড়াইয়া শিশুকে কোলে লইতে গেলেন—সে কোলে আসিল না, জোরে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিল। তখন নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত তিনি সবলে শিশুর হাত ধরিয়া টানিয়া জোর করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। শিশু উচ্চ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, পিতার বুকের উপর আছাড়ি পিছাড়ি করিতে লাগিল। শৈবলিনী বুক বাঁধিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

শৈবলিনী বুদ্ধিমতী বালিকা। সম্প্রতি মাতৃহীনা হইয়াছে, আজ তাহার বড় আদরের ভাই ভগিনীগুলি ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়াছে। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন একটা প্রবল ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম করিল। স্নেহময়ী স্বর্গীয়া জননীর মুখখানি মনে পড়িল—পিতার বিষণ্ণ মুখ ছল ছল দৃষ্টির উপর লক্ষ্য হইল—শঙ্কর দাদা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া মাথা নীচু করিয়া অশ্রুত্যাগ করিতেছে, তাহাও তাহার নয়নগোচর হইল। শৈবলিনীর ক্ষুদ্র হৃদয় আর কত সহ্য করিতে পারে? সে রোরুদ্যমান ভাই ভগিনী-গুলির মুখচুম্বন করিল। তাহার পর, শৈবলিনী একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া—আত্মীয় স্বজনগণকে পশ্চাতে রাখিয়া—রমণী জীবনের চির দাসত্বের বোঝা মাথায় করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে অশ্বযানে গিয়া আরোহন করিল। শ্বশুরবাড়ীর ক্ষ্যান্ত

চাকরাণীও গাড়ীতে উঠিল। হেমবাবুর আদেশে শঙ্কর চাকরও কোচবাক্সে কোচমানের পাশে গিয়া বসিল।

শৈবলিনী গাড়ীর জানালা খুলিয়া আর একবার পশ্চাতে চাহিল। সে দেখিল, তাহার পিতা শিশু পুত্রকে বুকে জড়াইয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত অচলভাবে দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিশু দিদি দিদি বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অন্য ভাই বোন্‌গুলি রেলিং জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে—চোখের জলে তাহাদের বুক ভাসিয়া যাইতেছে। শৈবলিনী সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিল না। ধৈর্য্যহীন হইয়া সে নিজেই উচ্চকণ্ঠে বলিল, শঙ্কর দাদা! দেরী কর্‌ছ কেন, গাড়ী হাঁকাও।

গাড়ী ছুটিল—বিষাদের ভরা বুকে পুরিয়া শৈবলিনী শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। অমনি হেমবাবু শিশুকে বুকে করিয়া ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া শয্যার উপর গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। আজ তিনি ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন, একমাত্র সুরবালার অভাবে এ সংসার তাঁহার পক্ষে অন্ধকারময় হইয়াছে।

(৮

ভবানীপুর হইতে অশ্বযানে উঠিয়া শৈবলিনী পটলডাঙ্গায় উপস্থিত হইল। গাড়ী শ্বশুরালয়ের অন্তঃপুরের পার্শ্বে ফটকের নিকট দাঁড়াইল। ক্ষ্যান্ত দাসী প্রথমে গাড়ী হইতে নামিল, তাহার পর, শৈবলিনীকে হাত ধরিয়া নামাইল। শঙ্কর চাকর কোচবাক্স হইতে নামিল। সে শৈবলিনীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া যাইবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এইবার তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া ধীরপদে সে শৈবলিনীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। কোমল কণ্ঠে কাতর স্বরে শঙ্কর বলিল, দিদিমণি! বাড়ী যাই?

শৈবলিনী অবগুণ্ঠন অল্প অপসারিত করিয়া শঙ্করের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার পর, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা!———, শৈবলিনীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল—চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—সে মাথা নীচু করিল।

শঙ্কর শৈবলিনীর অতি নিকটে আসিয়া মুখ নীচু করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত স্নেহসূচক বাক্যে বলিল, কি বল্‌তে চাও, বল দিদি ?

শৈবলিনী মুখ তুলিয়া বলিল, আমার বাবাকে যত্ন করো দাদা !

শঙ্কর বলিল, কর্‌বো।

শৈবলিনী বলিল, আমার ভাই বোন্‌দের মেরোনা দাদা !

শঙ্কর বলিল, না দিদি ! আর তাদের মার্‌বো না—একটা রূঢ় বাক্যও আর তাদের বল্‌বো না।

শৈবলিনী বলিল, তারা বড় অভাগা। তাদের ভালবেসো দাদা ?

"ভালবাস্‌বো।"

শঙ্করের মুখে আশ্বাসের বাণী পাইয়া শৈবলিনী যেন কতকটা স্বস্তি অনুভব করিল। সে বলিল, মাঝে মাঝে আমার সংবাদ নিয়ো দাদা !

শঙ্কর বলিল, নেব। তবে আসি দিদি ?

মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে শৈবলিনী বলিল, এস। বলিয়াই সে অন্তঃপুরের পথে একপদ অগ্রসর হইল—শঙ্করও কয়েকপদ চলিয়া গিয়া আবার দাঁড়াইল—আবার শৈবলিনীকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরের পথে আকুল দৃষ্টিতে তাকাইল। সে দেখিল, শৈবলিনী তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্কর আবার বলিল, তবে আসি দিদি ?

শৈবলিনী বলিল, এস দাদা !

শঙ্কর আবার কয়েক পদ চলিয়া গেল—আবার পশ্চাতে চাহিল। তখনও দেখিল, শৈবলিনী ঠিক সেইখানে সেইভাবে দাঁড়াইয়া তাহার

দিকে চাহিয়া আছে। দূর হইতে শঙ্কর উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বলিল, তবে আসি দিদি?

শৈবলিনী কথা কহিল না—শুদ্ধ ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, এস।

শঙ্কর অনেক দূরে চলিয়া গেল—শৈবলিনীও একপদ একপদ করিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিল। শঙ্কর আবার দাঁড়াইল—পশ্চাতে ফিরিল—দেখিল, শৈবলিনী মুখ বাড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে—তাহার দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। অতিদূরে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া শঙ্কর বলিল, দিদি! আসি তবে?

সে কি কাতর কণ্ঠধ্বনি! সে কি বুকভাঙ্গা বিদায়ের বাণী! যেন গভীর বিষাদভরা বেহাগের বাঁশী বাজিয়া উঠিল—কাঁপিয়া কাঁপিয়া সে কণ্ঠধ্বনি শৈবলিনীর ক্ষুদ্র বুকে প্রবল আঘাত করিল। শৈবলিনী দূর হইতেই মাথা নাড়িয়া জানাইল, এস।

শঙ্কর গলিপথ ঘুরিয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। আর সে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না। বাঁশের লাঠি কাঁধের উপর ফেলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল, অনেকদূর গেল। বড় রাস্তায় উঠিয়াই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আর যেন তাহার চরণ চলিতে চাহে না। কি যেন এক অমূল্য পদার্থ সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে—ফিরিয়া গিয়া আবার যেন তাহা বুকে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেছে। দিদির মুখখানা আবার একবার দেখিতে সাধ হইয়াছে। কিন্তু সে আর ফিরিল না—রাস্তার ধারে বারাণ্ডার উপর সে বসিয়া পড়িল। এক পয়সার কাবুলী মটর ভাজা কিনিয়া খাইতে গেল—মুখে যেন বিস্বাদ ঠেকিল। কাগজের ঠোঙ্গা দূর

করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কুকুর ছুটিয়া আসিয়া ঠোঙ্গাটা দুই একবার শুঁকিয়া সেও বোধ হয় বিস্বাদ মনে করিয়া চলিয়া গেল।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, দিদি! কত যত্নে তোমাকে মানুষ করেছি, না খেয়ে তোমাকে খাওয়ায়েছি, আজ তোমাকে ঠাকুর বিসর্জ্জনের মত পরের হাতে সমর্পণ করে' চলে যেতে হ'ল। তোমাকে না দেখে কি করে' যে আমি বেঁচে থাক্‌বো, ঠিক করে' উঠ্‌তে পার্‌ছি নে। হতভাগা আমি—সংসারে আমার কেউ নাই। তোমার পিতামাতা এ পথের জঞ্জালটাকে কুড়িয়ে এনে গলগ্রহ করেছিলেন—আমিও এ যাবৎ তোমাদের গলার হার করে' পরম সুখে ছিলাম। কিন্তু আমার কপাল পোড়া—মা ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন—তুমিও পরের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে। কার মুখের দিকে চেয়ে আমি বাঁচবো? দিদি! তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি, কি করে' তা জানাবো?

হতভাগা শঙ্করের দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া কাঁদিল। তাহার পর, আস্তে আস্তে উঠিয়া বাঁশের লাঠি কাঁধে লইয়া ভবানীপুরের দিকে হাঁটিয়া চলিল।

---

(৯)

বিবাহের পর শৈবলিনী আর কখনও শ্বশুরালয়ে আসে নাই—এই তাহার দ্বিরাগমন। ক্যান্ত দাসী শৈবলিনীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। অন্য কোন পরিজন আসিয়া আদর করিয়া শৈবলিনীর সহিত একটী কথাও কহিল না—তাহার মুখের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। শৈবলিনী দ্বিতলে একটা প্রকোষ্ঠের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘোষ-গৃহিনী হরসুন্দরী প্রথমে দেখিয়া লইল, দ্বিরাগমনে শৈবলিনীর সঙ্গে কি কি জিনিস-পত্র আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হেমবাবু অধিক কিছু দিতে পারেন নাই। কেননা, পত্নীর শ্রাদ্ধে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে—বর্ত্তমানে তাঁহার যথেষ্ট হাতখালি হইয়াছে। সুতরাং দুই দুইবার হেমবাবুর বিশেষ ক্রটি হইয়া গেল। প্রথমে পূজার তত্ত্ব হইল না, শেষে দ্বিরাগমনে ঘোষ বংশের মান গোছানো হইল না, হরসুন্দরীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বে প্রবল প্রতাপশালিনী ঘোষ-গৃহিণী কড়া হুকুম জারি করিয়া বসিলেন, বাড়ীশুদ্ধ কোন লোক নূতন বউএর সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবে না। খোদ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন অমান্য করা যাইতে পারে—শাস্ত্রের বিধানগুলিও অগ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু ঘোষ-পরিবারে কাহারও সাধ্য নাই, হরসুন্দরীর আদেশের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস করে। সুতরাং নূতন বউএর উপর এই কঠোর শাস্তির এক তরফা রায় বহাল হইয়া গেল, তাহার বিরুদ্ধে কোন আপীল আদালত হইল না, মুখে একটা বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না।

কক্ষের সম্মুখে শৈবলিনী অনেকক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া রহিল—কেহ তাহার কাছে আসিল না—বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাধ্য হইয়া বালিকা ধীরপদে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিল। কক্ষ-মধ্যে একখানি পালঙ্ক ছিল, সে তাহার একপার্শ্বে গিয়া বসিল। বালিকার বিষাদ-পূর্ণ ক্ষুদ্র বুকখানার উপর ফোটা ফোটা চোখের জল পড়িতেছিল। সুন্দর মুখখানি বর্ষাবিধৌত পদ্মফুলের ন্যায় অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। বালিকার প্রাণ মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হায়! কেহই বালিকার দুঃখ বুঝিল না—কেহই একটা সুমিষ্ট সান্ত্বনা-বাক্য বলিল না—মুখের কথাটী পর্য্যন্ত কেহ কহিল না। বালিকা মনে মনে ভাবিতেছিল, কেন ইহারা আমার উপর এমন ব্যবহার করিতেছে—আমার অপরাধ কি? কিন্তু হায়! কে তাহাকে তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবে? বালিকা নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে একজন দাসী কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরে আলো

জ্বালিয়া দিল। শৈবলিনী কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইল—দাসীটীও কেমন বিষণ্ণবদনে বালিকার পরম সুন্দর মুখখানার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু যেইমাত্র শৈবলিনী মুখ ফুটিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে গেল, অমনি সে দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—শৈবলিনী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বালিকা ভাবিল, দাসীটা পর্য্যন্ত কথা কচ্ছে না কেন? ক্ষ্যান্ত দাসী আমাকে চেনে—কত বার আমার বাপের বাড়ী সে গেছে। সেও আজ আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন কর্‌ছে? বালিকা অবাক হইয়া রহিল।

কেহই কথা কহিল না—আদর-যত্ন করিল না বটে কিন্তু শৈবলিনী মনে মনে চিন্তা করিল, একজন আছেন, তিনি নিশ্চয় কথা কহিবেন—আদর-যত্ন করিবেন। তিনি ত আমাকে পায়ে ঠেলিতে পারিবেন না; কিন্তু কোথায় তিনি—কখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে? হায়! অভাগিনী বালিকা সেই একজনের আশায় বুক বাঁধিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল—নব জলধরের আশায় যেন তৃষ্ণার্ত্ত চাতকিনী ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকিল।

ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। একজন দাসী আসিয়া কক্ষতলে একখানি আসন পাতিয়া এক গ্লাস জল রাখিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই পাচক ব্রাহ্মণ অন্নব্যঞ্জন-পূর্ণ থালা রাখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। শৈবলিনী ভাবিল, এ আহারের আয়োজন নিশ্চয় তাহার স্বামীর জন্য। এখনই তাহার স্বামী কক্ষ-মধ্যে আসিবেন—তাহাকে আদর করিয়া বক্ষে ধারণ করিবেন। লজ্জায় হর্ষে জড়-সড় হইয়া অভাগিনী স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, অন্নব্যঞ্জন ঠাণ্ডা হইতে চলিল কিন্তু কেহই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল না। শৈবলিনী ভাবিল, ব্যাপার কি? এখনও তিনি আসিতেছেন না কেন? পোড়াকপাল আমার—তিনিও কি আমার উপর বিরূপ হইলেন? তিনি ত তেমন প্রকৃতির লোক নহেন!

মনে পড়িল, বিবাহের রাত্রিতে বাসর ঘরের কথা। তিনি তাহাকে কত আদর করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করিয়াছিলেন। মনে পড়িল, ফুলশয্যার রাত্রির কথা, যে দিন তিনি তাহাকে আদরিণী—চির জীবনের প্রিয় সঙ্গিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন—কত ভালবাসার কথা বলিয়া তাহার অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্বর্গরাজ্যের পবিত্র আশার আলো জ্বালিয়া দিয়াছিলেন এবং অভাগিনী এ যাবৎ সেই সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল। এই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারিয়াছেন, যে তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? শৈবলিনার চক্ষে জল আসিল—সে উপাধানে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সহসা কক্ষের বাহিরে হরসুন্দরী চীৎকার করিয়া বলিল, ও ক্ষ্যান্ত! নূতন বউটাকে বামুনঠাকুর ঘরে ভাত দিয়ে এসেছে ত?

শৈবলিনী চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। সে ভাবিল, ও হরি! এ অন্নব্যঞ্জন যে আমার জন্য রেখে গেছে! কেন, আমি ঘরের বউ—রান্নাঘরে যাব, আমার জন্য এ ব্যবস্থা কেন হ'ল?

কক্ষের বাহিরে পুনরায় গৃহিণীর কণ্ঠবীণায় ঝঙ্কার উঠিল, রাগ করিস্‌নে তোরা। ছোটলোকের মেয়ে হ'লেও দুটী খাবে পর্‌বে ত? ওর বাবা শুনেছি, চামার। তা চামারের মেয়ের কি ক্ষিদে তেষ্টা নেই?

সরলমতি বালিকা ভাবিল, কি আশ্চর্য্য! আমি ত কায়স্থের কন্যা—আমার পিতা চামার হ'লেন কি করে'?

অভাগিনী জানে না, অর্থের অভাবে আজ কত পিতাকে চামার কসাই পর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইয়াছে—কন্যাদায়ে যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও নিস্তার পাইতেছে না, তাহার ঊর্দ্ধতন পুরুষকেও পরলোকে বসিয়া কুৎসিত নিন্দা শ্রবণ করিতে হইতেছে—বার্ষিক শ্রাদ্ধে বংশধরের হস্তে জলপিণ্ডদানের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে কুটুম্বের প্রদত্ত অখাদ্যে তাহাদের উদর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

শৈবলিনী আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে জল আসিল—বালিকা শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। অচিরে নিদ্রা আসিয়া তাহার সকল জ্বালার অবসান করিয়া দিল।

---

(১০)

দুই চারিদিন কাটিয়া গেল—শৈবলিনী সেই নির্জ্জন কক্ষে নীরবে কাল কাটাইতে লাগিল। পাষাণ-হৃদয় শ্বাশুড়ী একটা নিরীহ বালিকার উপর এ প্রকার কঠোর শাস্তি বিধান করিল। বালিকার প্রাণ হাফাইয়া উঠিতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে পারে না। একজন দাসী যদি তাহার কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করে, শৈবলিনী ছুটিয়া তাহার কাছে যায়—কাতরভাবে তাহার মুখের দিকে তাকায়। সে করুণ দৃশ্যে দাসীরও বুক ফাটিয়া যায় বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহার সহিত কোন কথা বলিতে পারে না, কেন না, গৃহিণী যদি জানিতে পারে, বাঘের মত লাফাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িবে—তাহাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। কাজেই দাসী শৈবলিনীর সহিত বাক্যালাপ না করিয়া পলায়ন করে। শৈবলিনী হতাশ হইয়া শয্যার উপর গিয়া বসিয়া পড়ে।

গৃহিণীর কন্যার নাম ঊষারাণী, ডাক নাম পুঁটু। সে শৈবলিনীর সমবয়স্কা। মায়ের আদুরে মেয়ে। গৃহিণী পাহারায় রাখিয়াছিল, তাহার কন্যাকে। কন্যা অলক্ষিতে থাকিয়া সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিত, কেহ নূতন বউএর সহিত গোপনে কথা কয় কি না। পুঁটুর গোয়েন্দাগিরি বড়। সাংঘাতিক ছিল। জানালার ফাঁকে, দরজার আড়ালে সর্ব্বদা তাহার

নয়ন দুইটী সজীব হইয়া থাকিত। যদি কেহ ইসারা-ঈঙ্গিতেও নূতন বউএর সঙ্গে আলাপনের চেষ্টা করিত, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার জননীকে সংবাদ জ্ঞাপন করিত। অমনি গৃহিণী সিংহী-গর্জ্জনে সে বিশাল অট্টালিকা কাঁপাইয়া তুলিত, ভয়ে পুরবাসীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে আজও এমন কোন খ্যাতনামা কর্ম্মচারীর নাম শুনিতে পাওয়া যায় নাই, যিনি ভূয়োদর্শন ও সূক্ষ্মানুসন্ধানে ঘোষ-নন্দিনীকে হারাইয়া দিতে পারেন।

কোন দাসী বা পুরবাসী নূতন বউএর কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পুঁটু অতি সঙ্গোপনে আলমারার আড়ালে কিম্বা ঘরের কোণে গুটানো মাদুরের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকিত, কখন কখন বা পালঙ্কের নীচে পলাইয়া থাকিত। কাজেই এত সতর্ক পাহারায় ধরা পড়িবার ভয়ে অত্যন্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ নূতন বউএর সহিত অতি গোপনেও দুটো সান্ত্বনার কথা বলিতে সাহস করিত না। সহসা একদিন শৈবলিনী পুঁটুকে গেরেফতার করিয়া ফেলিল। ঘোষ-নন্দিনী অতি গোপনে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিতেছিল, শৈবলিনী তাহা জানিতে পারিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। সে পলায়নের চেষ্টা করিল কিন্তু শৈবলিনীর হাত ছাড়াইতে পারিল না, টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল।

শৈবলিনী কাতর কণ্ঠে বলিল, ঠাকুর-ঝি! একটা মুখের কথা বল, কেন তোমরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ? কথা বল্‌বার লোক না পেয়ে আর যে বাঁচিনে ভাই?

পুঁটু কোন উত্তর না দিয়া কেবল জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শৈবলিনী আজীবন সিমলা পাহাড়ের

স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়াছে, কাজেই তাহার চেয়ে শৈবলিনীর শরীরে শক্তি অধিক ছিল, সে বাঘে ধরা ছাগলের মত কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

শৈবলিনী আবার বলিল, ঠাকুর-ঝি। বিয়ের সময় যখন এসেছিলাম, আমার সঙ্গে কত হেসে হেসে কথা বলেছিলে, দিন রাত্রি আমার পাশে পাশে থাকৃতে কিন্তু আজ কেন তুমি এমন হ'লে আমাকে সত্য বল ভাই ?

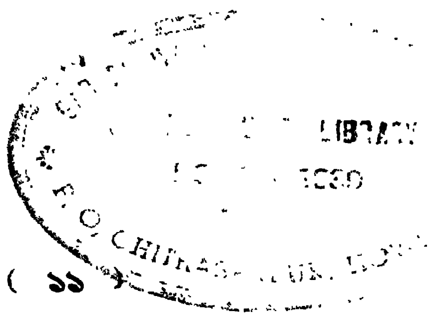
কিন্তু ঠাকুর-ঝির মুখে কোন কথা নাই—সে বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শুদ্ধ পলায়নের জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন কিছুতেই সে শৈবলিনীর সবল সুদৃঢ় মুষ্ঠি হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিয়া কেমন একটা অব্যক্ত চিংকার করিয়া উঠিল। অমনি ভীতভাবে শৈবলিনী তাহার হাত ছাড়িয়া দিল—পুঁটুঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

পরক্ষণেই ঘোষ-গৃহিণী কক্ষের বাহিরে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিল, কি সর্ব্বনেশে ছোটলোকের পাহাড়ে মেয়ে গো! গায়ে যেন পালোয়ানের শক্তি! জোর করে' আমার দুধের মেয়ের ননীর মত হাতখানা ধরে' রাখে, এত বড় বুকের পাটা তার? হতভাগিনী জানে না, তার বাপের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘোষ-বংশের উচু মাথা নীচু হ'য়ে গেছে। পূজার সময় তত্ত্ব করে না—দ্বিরাগমনে বড় ঘরের মান রাখে না, এত বড় ছোটলোক যার বাবা, সে আমার মেয়ের হাত ধরে, তার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করে?

তাহার যে অপরাধ কি, আজ ঘোষ-গৃহিণী জনান্তিকে স্পষ্টভাবে শৈবলিনীকে শুনাইয়া দিয়া গেল। আজ অভাগিনী বালিকা বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার ত্রুটিতে তাহার উপর এ শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু সে ক্রটীর প্রতিকার করিতে শৈবলিনীর কি শক্তি আছে? তাহাকে যদি এমনিভাবে নির্জ্জন কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে—যন্ত্রণা দেয়—পলে পলে মৃত্যুর মুখে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে কে তাহার মুখের দিকে তাকাইবে? বালিকা মরণের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল।

শৈবলিনী এ কঠোর শাস্তি অম্লানবদনে মাথায় পাতিয়া লইতে পারিত, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও একজনের সেই সুন্দর মুখখানি একবার চক্ষে দেখিতে পাইত—যদি একদিনের তরেও সে তাহার সম্মুখে আসিয়া একটা আশার বাণী বলিত। শৈবলিনীর দুইটী চক্ষু তৃষিত চাতকের মত দিন রাত্রি কাহাকে অনুসন্ধান করিত; বাহিরে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিলেই যে কোন ছলে বারাণ্ডার উপর গিয়া দাঁড়াইত, কিন্তু হায়! অভাগিনীর এ কামনাটুকুও পূর্ণ হইল না। এতদিনের পরে বাস্তবিক তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল।



(১১)

কার্ত্তিক মাসের পড়ন্ত বেলায় ক্ষ্যান্ত দাসী ছাদের উপর উঠিয়া যখন আম্‌সী শুকাইয়া হাঁড়ি ভরিতেছিল, তখন বোসেদের ছাদে সশরীরে দেখা দিল, বোস-গিন্নী। বোস-গিন্নীর বয়স চল্লিশের নিকটে—দোহারা গঠন, দেখিতে সুশ্রী—তাহার নাম মহামায়া। মুখখানি সর্ব্বদা হাসিমাখা বটে কিন্তু মহামায়ার বুকখানা যেন দুষ্ট বুদ্ধিতে ভরা। ক্ষ্যান্ত দাসী পূর্ব্বে অনেককাল বোসেদের বাড়ী দাসী-গিরি করিয়াছিল, কাজেই সে বোস-গিন্নীকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত।

মহামায়া নিজেদের ছাদের 'আলিসা' ধরিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষ্যান্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওরে ক্ষ্যান্ত! শুনেছি, তোদের নূতন বউমা এসেছেন, ছাদের উপর বেড়াতে আসেন না কেন?

ক্ষ্যান্ত দাসী মহামায়ার প্রকৃতি ভালরূপ জানিত। একটা কথার সূত্র ধরিয়া বোস-গিন্নী যে ঘোষ-গিন্নীকে দু'কথা শুনাইয়া দিতে আসিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। দুই ঘর বড়লোক পাশাপাশি বাস করে—দুই ঘরের দুই গিন্নীতে দিন রাত্রি বিবাদ চলে। এই বিবাদের সূত্রপাত হইতে দুই ঘরেই পরস্পরে মনোমালিন্য চলিয়াছে। অবশেষে কান ভাঙ্গানিতে পুরুষেরা পর্য্যন্ত সেই বিবাদে যোগদান করিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বে দুই ঘরে সদ্ভাব ছিল—পরস্পরের সুখে দুঃখে সহানুভূতি ছিল—আমোদে উৎসবে নিমন্ত্রণ চলিত—দুই পরিবারে যেন হরি-হর আত্মা

ছিল। কিন্তু কি কুক্ষণে হরসুন্দরীর সহিত মহামায়ার দেখা সাক্ষাৎ হইল—তাহারা আদায় কাঁচকলার সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিল, নানাকারণে ঝগড়া বিবাদ চলিতে লাগিল।

ঘোষ-গৃহিণী হরসুন্দরী যেমন অহঙ্কারী তেমনই কলহপ্রিয় ছিল। সামান্য একটা কথার আঘাত সহ্য করিতে পারিত না—উচ্চ চীৎকারে পাড়া মাতাইয়া তুলিত। বোস-গিন্নী মহামায়া কাট্-পিঁপ্ড়ের মত কটাস্ করিয়া একটা কথার কামড় দিত—ঘোষ-গিন্নী রাগে উন্মত্ত হইয়া লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিত। সয়তানি বুদ্ধিতে মহামায়া অজেয় ছিল—ঘোষ-গিন্নীকে রাগাইয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া সে 'মজা' দেখিত।

এই প্রকারে মজা দেখিতে দেখিতে শেষে দুই পরিবারে যথার্থই বিবাদ বাধিয়া গেল—মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। তবে ছাদের উপর উঠিলেই দুই গিন্নীতে যে গজকচ্ছপের লড়াই বাধিয়া যাইত, ইহা নিবারণের কোন উপায় রহিল না। বোস-গিন্নী দুষ্টবুদ্ধিতে বিশেষ পরিপক্ক ছিল, সেই প্রথমে কথার কামড়ে জ্বালা ধরাইয়া দিত—দাম্ভিকা হরসুন্দরী সে জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া ইতর লোকের মত গালি-গালাজ করিয়া ভূত ভাগাইয়া দিত।

ক্ষ্যান্ত দাসী প্রথমে বোস-পরিবারে চাকরী করিত—তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। বোস-গিন্নীর উপর রাগের বশে হরসুন্দরী অধিক বেতন স্বীকার করিয়া ক্ষ্যান্ত দাসীকে ভাগাইয়া লইল। মহামায়াও ছাড়িবার পাত্রী নহে। ক্ষ্যান্ত দাসী যখন ভাগিয়া গেল, তখন সে ঘোষ-গিন্নীর খাস চাকরাণী বামাকে ভাগাইয়া আনিল। এই প্রকারে চাকরাণী ভাগাভাগি হইতে চাকর ভাগিতে লাগিল—দ্বারবান ভাগিতে লাগিল, সরকার কর্ম্মচারীও অনেক ভাগাভাগি হইয়া গেল। অবশেষে দেখা গেল, বোসেদের চেয়ে

ঘোষেদের ক্ষতি বেশি হইল। ঘোষ-গিন্নী হরসুন্দরী অন্তরে অন্তরে জ্বলিতে লাগিল।

ক্ষ্যান্ত দাসী অনেককাল বোসেদের বাড়ী চাকরী করিয়াছিল—মহামায়াকে সে ভালরূপ চিনিত। বোস-গৃহিণী যতই দুষ্ট প্রকৃতির লোক হউক না কেন, তাহার হৃদয় মন্দ ছিল না। মুখের কথার কাগড় খুব ছিল বটে কিন্তু দাস দাসীর উপর মায়া-মমতাও যথেষ্ট ছিল। ক্ষ্যান্ত অর্থের প্রলোভনে ঘোষ-পরিবারে ঢুকিয়া বসিয়াছে বটে কিন্তু ঘোষ-গৃহিণীর প্রকৃতি দেখিয়া এখন সে একেবারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষ্যান্ত দাসী-গিরি করে সত্য কিন্তু সে কায়েতের ঘরের মেয়ে—পেটের জ্বালায় সে আজ হীনভাবে স্বজাতির দ্বারে পড়িয়া আছে। সে আজ বুঝিয়াছে, সামান্য অর্থের লোভে বোসেদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছে।

ক্ষ্যান্ত হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি চাকরাণী মানুষ—বড় ঘরের বউ-গিন্নীর কথা আমি কি জানি মা?

মহামায়া হাসিয়া বলিল, কেন, বড় ঘরে ঢুকে ভালমন্দ খেয়ে ঢেকুর তুল্‌তে পারিস্, তাদের ঘরের খবর জানিস্ না?

ক্ষ্যান্ত বলিল, কথায় বলে, বাঘ ভালুকে যুদ্ধ হয়, নল-খাগড়ার প্রাণ যায়। আমরা গরীব লোক, অর্থের পিত্যেশে আপনাদের দোরে পড়ে থাকি। আমাদের কেন ঝগড়া বিবাদের মাঝখানে টেনে আনেন? ঘোষ-গৃহিণীর হুকুম হয়েছে, নূতন বউ যেন ছাদে না আসে।

বোস-গৃহিণী বলিল, কেন বল দেখি? নূতন বউ ত কর্পূর নয়, যে হাওয়া লেগে উড়ে যাবে? ক'দিন বউমা এসেছেন শুনেছি, একটু দেখ্‌বো বলে' দিন রাত্রি ছাদের উপর ছুটোছুটী কর্‌ছি। বিয়ের সময়

দেখেছিলাম, বউ দেখে সত্যই চোখ জুড়িয়েছিল। হ্যাঁরে ক্ষান্ত! এমন বউকে তোরা নাকি অযত্ন করিস্?

ক্ষ্যান্ত নূতন বউএর বর্ত্তমান দুরবস্থায় বড় কাতর হইয়াছিল। একটা বালিকা বউএর উপর ঘোষ-গৃহিণীর অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া দাসী হইয়াও ক্ষ্যান্ত অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ঘোষ-গৃহিণীর বিরুদ্ধে কথা বলিবার সাহস স্বয়ং কর্ত্তার নাই, সেত সামান্য দাসী মাত্র। ক্ষ্যান্ত বোস-গৃহিণীর কথার কোন উত্তর না দিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পশ্চাতে শার্দ্দুল-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইল, ক্ষ্যান্ত! হচ্ছে কি? কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্?

ক্ষ্যান্ত চমকিত হইয়া ভীতভাবে বসিয়া পড়িল, তাহার পর তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিতে লাগিল।

ঘোষ-গৃহিণী নিঃশব্দে ছাদের উপর উঠিয়া দাসীকে বোস-গৃহিণীর সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়া আগুনে ধূনা পড়িলে যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইভাবে রাগে অগ্নি-অবতার হইয়া দাসীকে ধম্‌কাইয়া উঠিল। হরসুন্দরী আবার বলিল, তোকে শতবার নিষেধ করেছি, ছাদে উঠে কারো সঙ্গে কথা বল্‌বিনে। আমার কথা কেন শুনিস্ না বল্ দেখি?

ক্ষ্যান্ত দাসী কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

---

(১২)

অপর ছাদের উপর বোস-গৃহিণী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। বোস-গৃহিণী মাথা উচু করিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে না হয় দাসীর নূতন পীরিত হয়েছে, কিন্তু আমার সঙ্গে পুরাণো পীরিত ছিল, তাই একটু কথা বলেছে, তাতে দোষ কি হয়েছে ?

রাগতভাবে হরসুন্দরী বলিল, বুড়োবয়সে অত পীরিতের ধার ধারিনে। বোস-গিন্নি ! তোমাকে নিষেধ কর্‌ছি, আমাদের বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গে কথা বলো না।

মহামায়া বলিল, আমি ত তোমার খাস তালুকের প্রজা নই, যে তোমার নিষেধ আমাকে শুন্‌তেই হ'বে ? আদেশ কর্‌তে হয়, ঘোষ-কর্ত্তার উপর চালিয়ো—তিনি শুন্‌বেন, কেননা, তুমি যে তাঁর তৃতীয় পক্ষ—গলার হার—অন্তরের মাণিক।

হরসুন্দরী বলিল, আর তুমি বুঝি বোসকর্ত্তার দুয়োরাণী ?

মহামায়া বলিল, বোসকর্ত্তার পক্ষদোষ নেই—আমিই একে চন্দ্র হয়ে আছি। কিন্তু ঘোষকর্ত্তার দুই এ পক্ষ ছাড়িয়ে গিয়ে তুমি যে তিন এ নেত্র হ'য়ে বসেছ। কথায় বলে,——

এক-বরে স্বামীর স্ত্রী চিংড়ী মাছের খোসা,
দোজবরে স্বামীর স্ত্রী নিত্য করেন গোঁসা।
তেজবরে স্বামীর স্ত্রী পাতে বসে' খায়,
চতুর্বরে স্বামীর স্ত্রী কাঁধে চড়ে যায়।

ঘোষ-গিন্নি! যদি এক ধাপ পিছিয়ে আস্‌তে একেবারে গাধার পিঠে শেতলা ঠাকরুণ হ'য়ে বস্‌তে।

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া হরসুন্দরী বলিল, কি—আমার স্বামী গাধা? ছোট মুখে এত বড় কথা?

মহামায়া বলিল, আমার মুখ ছোট হ'তে পারে সত্য কিন্তু কথা ছোট হ'বে কেন ঘোষ-গিন্নি? যে পুরুষ মানুষ স্ত্রীর কথায় ওঠে—বসে, সে গাধা নয়ত কি?

হরসুন্দরী যদি যথার্থই ব্যাঘ্রী হইত, এতক্ষণে ছাদের আলিসা ডিঙ্গাইয়া লাফ দিয়া মহামায়ার ঘাড়ের উপর পড়িত—তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া খাইত কিন্তু ভগবান তাহাকে গড়িয়াছেন মানুষ—প্রকৃতি দিয়াছেন বাঘিনীর মত। সে লাফাইতে পারিল না—শুদ্ধ গর্জ্জন করিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিল।

খাঁচায় পোরা সিংহিনীকে খোঁচা মারিয়া লোকে যেমন গর্জ্জন শুনিয়া কৌতুক দেখে, মহামায়াও তেমনইভাবে হরসুন্দরীকে রাগাইয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্য করিতে লাগিল। ক্রোধভরে হরসুন্দরী বলিল, বোস-গিন্নি! তুমি নেহাত ছোটলোক—বেইমান!

মহামায়া বলিল, আমি ছোটলোক কি তুমি ছোটলোক হিসাব করে বলো ঘোষ-গিন্নি! চোদ্দ বছরের একটা বালিকা বউকে ঘরে এনেই কোন্ ভদ্রলোকে তাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয় বলত?

হরসুন্দরী বলিল, আমার বউএর উপর আমি যেমন ব্যবহার করি না কেন, আড়ি পেতে ঘরের খবর নিতে যায়, কোন্ ভদ্রলোকে বলত ?

মহামায়া বলিল, গলাবাজি করে' যখন নিজের কুটুম্বকে চামার কসাই বলে' ঘোষণা কর, সেটাও কি আড়ি পেতে শুন্‌তে হয় ?

হরসুন্দরী বলিল, কুটুম্বের আক্কেলকে বল্‌তে হয়, যার ব্যবহারে ছোটলোকের মুখনাড়া সহ্য করতে হয়, তাকেই গাল দিতে হয়। তাতে তোমার 'আঁতে' ঘা লাগে কেন বোস-গিন্নি ?

মহামায়া বলিল, আঁতে ঘা লাগে এইজন্য, চামার কসাই যার কুটুম্ব, তাকে স্বজাতি বলে' পরিচয় দিতে হয়।

হরসুন্দরী গর্ব্ব করিয়া বলিল, পটলডাঙ্গার ঘোষেদের হাওয়া গায়ে লেগে কত মেথর মুদ্দফরাস বোস-কায়েত হয়েছে।

মহামায়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, তার সাক্ষী আছে, হাঁসখালির জেলেরা দত্ত-কায়েত হ'য়ে গেছে।

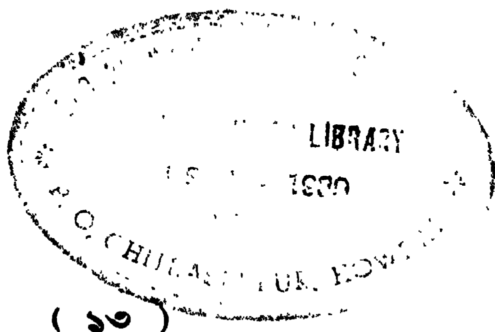
পিতার কুলে লোহার মুগুরের আঘাত পড়িল—ক্রোধে অভিমানে হরসুন্দরীর চক্ষে জল আসিল। উত্তেজিত হইয়া হরসুন্দরী বলিল, মুখ সাম্‌লে কথা বলো, বোস-গিন্নি ? তোমার নামে আদালতে মানহানির চার্জ্জ আন্‌বো।

মহামায়া বলিল, আর আমিও তোমার কুলের কথা গেজেট করে' দেব।

বুনো ওল বাঘা তেঁতুলের কাছে হার মানিল। হরসুন্দরী বোস-গৃহিণীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে নীচে নামিয়া আসিল। প্রথমেই তাহার লক্ষ্য হইল, শৈবলিনী বিষাদময়ী প্রতিমার মত কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হরসুন্দরীর নয়ন হইতে যেন বিষুবিয়সের অগ্ন্যুদ্‌গম হইল। বাঘের সম্মুখে ছাগ-শিশু যেমন ভীত

কম্পিত হয়, হরসুন্দরীর ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শৈবলিনীর অন্তরাত্মা তেমনিভাবে কাঁপিয়া উঠিল—সে ভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। হরসুন্দরী কক্ষের বাহিরে গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, সর্ব্বনাশীর মেয়ে আমার ঘরে এসে জাত কুল সব গেল। যদি মরে' যেত, আমার হাড় জুড়াতো—আবার আমি ছেলের বিয়ে দিতাম।

অমনি শৈবলিনী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, মাগো! কোথায় আছ তুমি? আর যে আমি সহ্য কর্‌তে পারিনে—আমাকে পায়ে স্থান দাও। বলিয়াই অভাগিনী বালিকা শয্যার উপর গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।



(১৩)

অনুকুলচন্দ্র ব্যস্তভাবে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া পত্নী সুরমাকে বলিল, সুরমা! তোমরা কি মানুষ নও?

সুরমা স্বামীর ভঙ্গি দেখিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, আমরা যদি মানুষ না হই, তোমার মত মানুষটী আমাদের দলে ঢুকে বস্‌লো কেন?

অনুকুল বলিল, তোমাদের দলে ঢুকে বসে যে বেয়াকুবী হয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুরমা বলিল, তাহ'লে নিজের হাতে নিজের কান মলে' বেয়াকুবীর শাস্তি নিয়ে আমাদের দল থেকে সরে দাঁড়াও না?

অনুকুল বিরক্তভাবে বলিল, সরে যাই যে কোন্ চুলোয় ভেবে পাইনে। সুরমা! ছোট বউমাটী দুধের বালিকা—সম্প্রতি মাতৃহীনা হয়েছে—বড় শোক পেয়েছে। তাকে ঘরে এনে তোমরা জ্বালা-যন্ত্রণা দিচ্ছ—মড়ার উপর খাঁড়ার আঘাত কর্‌ছ, এ কি ব্যবহার তোমাদের?

সুরমা বলিল, কথাগুলো আমাকে না বলে' তোমার গর্ভধারিণীকে গিয়ে বল না? সে দিকে মাড়াতে ত সাহস হয় না, কেবল আমার উপর দিন রাত্রি হুম্‌কী!

অনুকুল বলিল, তুমি আমার কথা শোন না কেন ?

"কি শুন্‌বো ?"

"আমি হুকুম দিচ্ছি, তুমি বউমার কাছে যাও—তার সঙ্গে কথা কও—তাকে আদর-যত্ন কর।"

সুরমা বলিল, তারপর যখন তোমার জননী বাঘের মত আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে আমাকে ছিঁড়ে খাবেন, তখন উপায় ?

অনুকুল বলিল, তোমাকে ছিঁড়ে খাবেন কি করে ? মা ত রাক্ষসী নয় ?

সুরমা বলিল, রাক্ষসীদেরও মায়া-মমতা থাকে শুনেছি। জরা রাক্ষসী জরাসন্ধ রাজাকে না খেয়ে যোড়া-তাড়া দিয়ে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের গৃহিণী যারা, তারা বালিকা বউএর কচি মাথা চিবিয়ে খায়, তার ঢের নজির আছে। কোন রকমে এ যাবৎ নিজের মাথাটী বাঁচিয়ে রেখেছি, তুমি ইচ্ছা কর, সেটা তোমার গর্ভধারিণীর উদরে ঢুকে যা'ক ?

অনুকুল বলিল, যদি প্রকাশ্যে সাহস না কর, গোপনে বউমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর—দুটো মিষ্টি কথা বলে' সান্ত্বনা দাও। তা না হ'লে পরের মেয়ে দম আট্‌কে মরে যাবে যে ?

সুরমা বলিল, তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি হ'বে।

অনুকুল বলিল, কেন ?

সুরমা বলিল, তা আর বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ? তোমার ভায়াটী আবার চতুর্দ্দোলায় উঠে, গোরা বাদ্যি বাজিয়ে বউ আন্‌তে যাবে। আবার বরপণের দর কষাকষি হ'বে, দানসজ্জায় তোমাদের অট্টালিকা

ভরে যাবে। তারপর, পূজার তত্ত্ব, শীতের তত্ত্ব, গো-ফাল্গুনের তত্ত্ব পর্য্যন্ত ঘরে উঠ্‌বে। তোমরা পুরুষজাতি, যতবার বউ মরে তোমাদের তত লাভ। যদি তার প্রমাণ চাও, আমাকে অনুমতি দাও, একভরি আফিং গিলে মরে দেখাই।

অনুকূল বলিল, না গো না, তোমাকে মরে দেখাতে হ'বে না। তুমি বেঁচে থেকে গৃহিণী হও। তারপর, ছেলের বউ ঘরে এনে তাকে এমনিভাবে সাজা দাও। কিন্তু মনে থাকে যেন, বউরা যখন বড় হ'য়ে গৃহিণী হ'বে, তখন এই জ্বালা-যন্ত্রণা সুদে আসলে আদায় করে' ছাড়্‌বে।

সুরমা বলিল, তুমি সতর্ক করে' দিচ্ছ বটে কিন্তু ওটা যে আমাদের জাতির ধর্ম্ম!

অনুকূল বলিল, জাতির ধর্ম্ম হ'ল কি করে?

সুরমা বলিল, জাতির ধর্ম্ম বই কি! কুকুর যখন বাচ্চা থাকে, তখন শেয়ালে তাকে ধরে খায় কিন্তু যেই সে বাচ্চা বড় হয়, অমনি সে শেয়াল তাড়িয়ে ছিঁড়ে খায়।

অনুকূল বলিল, তুমি বল্‌তে চাও, স্ত্রীলোক কুকুরের জাতি?

সুরমা বলিল, তা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? কুকুর প্রভুভক্ত হয়, আমরাও পুরুষভক্ত হই। কুকুর প্রভুর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, উচ্ছিষ্ট খায়, আমরাও পুরুষের পদসেবা করি, পাতের প্রসাদ খাই। কুকুর প্রভুর ঘর চৌকী দেয়, চোর ডাকাত তাড়ায় বলে' দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। আমরাও পুরুষের দাসী-গিরি করি শুদ্ধ পেটের জ্বালায়। কুকুরকে 'তু' বলে' ডাক্‌লে কাছে এসে মুখের পানে চেয়ে লেজ নাড়ে, আবার দুর্ বল্‌লে তফাৎ যায়। আমরাও কখন পুরুষের

আদর পেয়ে আহ্লাদে গলে যাই, আবার কখনও চোখরাঙ্গানি সহ্য করে' চোখের জলে বুক ভাসাই। শুদ্ধ এক বিষয়ে কুকুরের সঙ্গে আমাদের মিল নাই।

অনুকূল বলিল, কি ?

সুরমা বলিল, কুকুর প্রভুর এত করেও ইজ্জত বজায় রেখে ছাই গাদায় নেয় সজ্জা, আমরা নারী পুরুষের পাশে থেকে লুটিয়ে দেই মান ইজ্জত আর লজ্জা। কুকুরের চেয়েও নীচ কিনা, তাই বাঙ্গালীর ঘরের বউ আমরা এত নির্য্যাতন সহ্য করি, অম্লানবদনে—আনতমস্তকে। কুকুর যদি ব্যথা পায়, সেও ঘাড় ফুলিয়ে গর্জ্জন করে, কিন্তু আমরা নারী পায়ের তলায় মাড়িয়ে গেলেও মুখের কথাটী বল্‌বার অধিকার আমাদের নাই।

অনুকূল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, নারীর উপর সমাজের এ অন্যায় অত্যাচার।

অমনি সুরমা বলিল, চুপ্ কর গো চুপ্ কর। মনে রেখো তুমি সমাজপতি নও—সমাজপতি তোমার মা।

অনুকূল বলিল, কিছুতেই না—মার কথা শুন্‌বো না—একটি দুগ্ধপোষ্য বালিকার উপর এ অত্যাচার হ'তে দেব না।

সুরমা অনুকূলের হাত ধরিয়া বলিল, ক্ষেপে গেলে নাকি ? তুমি কি করতে চাও, বল দেখি ?

অনুকূল বলিল, আমি এখনই বউমার কাছে যাব—তার সঙ্গে কথা বল্‌বো, তাকে কোলে তুলে নেব।

সুরমা হাসিয়া বলিল, পাগল তুমি। জান, তুমি ভাশুর, ভাদ্রবধূ ? তাকে স্পর্শ কর্‌বার অধিকার তোমার নাই।

অনুকূল বলিল, আমার যদি সে অধিকার না থাকে, আমার হুকুম, তোমাকে তার কাছে যেতেই হ'বে।

সুরমা বলিল, তোমার হুকুম আমি পালন কর্‌তে বাধ্য কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার মার হুকুমে কাল আমাদের গাছতলাতে দাঁড়াতে হ'বে।

অনুকূল বলিল, আমার বাবা বেঁচে থাক্‌তে মা আমাদের উপর এ হুকুম চালাতে পার্‌বেন ?

সুরমা বলিল, তোমার বাবা যে বেঁচে আছেন, এ বিশ্বাস আমার নাই—তাহ'লে তাঁর চোখের সম্মুখে এত বড় অত্যাচারটা ঘট্‌তে পারে ? তারপর, তোমার ভাইটী নেহাত ছেলে মানুষ নয়—সে বিদ্বান বুদ্ধিমান। তার স্ত্রীর উপর এত অত্যাচার হচ্ছে, সে নীরবে আছে কেন ? তুমি যাও, আগে গিয়ে দেখ, তোমার পিতা ও ভ্রাতা মৃত কি জীবিত।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া অনুকূল শান্ত হইয়া ধীরপদে গৃহত্যাগ করিল।

---

(১৪)

বালিকা শৈবলিনীর উপর অত্যাচার আরও বাড়িয়া চলিল—সে দিন রাত্রি শ্বাশুড়ীর গালি-গালাজ সহ্য করিতে লাগিল। তবুও বালিকা এতকাল আশা করিয়া বসিয়াছিল, তাহার স্বামী হয়ত তাহার কাছে আসিবে, তাহার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিবে কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া গেল, অভাগিনী একদিনের তরেও স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল না। সে তখন ভাবিল, তাহার স্বামীও তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছে। বালিকা হতাশ হইয়া পড়িল—তাহার মরণের সাধ জন্মিল।

দিবা দ্বিপ্রহের সময় শৈবলিনী পালঙ্কের উপর বসিয়া বাম করতলের উপর গণ্ডস্থল রক্ষা করিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল। সম্মুখে গবাক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত—নিম্নে বিশাল রাজপথে অবিরত জনস্রোত চলিয়াছে। কিন্তু শৈবলিনীর দৃষ্টি সে দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার মানস-পটে সিমলা পাহাড়ের একটী দৃশ্য প্রতিফলিত হইয়াছিল। শৈবলিনী দেখিতেছিল, তাহার পিতা আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া

আসিয়া বিষণ্ণবদনে পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতেছেন—হাত মুখ ধুইবার জল পাইতেছেন না—সামান্য একটু জলযোগের দ্রব্যও কেহ আনিয়া হাতে দিতেছে না। তাহার ছোট ভাই ভগিনীগুলি চারিদিকে কাঁদাকাটি করিতেছে, আর শঙ্কর চাকর চোখ রাঙ্গাইয়া তাহাদের ধমক দিতেছে। দুঃখে শোকে ক্ষোভে শৈবলিনীর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল—অশ্রুজল বাদলের বারিধারার মত বাম করতল প্লাবিত করিয়া বসুন্ধরা সিক্ত করিতেছিল।

এমন সময় এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ অতি সন্তর্পণে প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ধীরপদে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল, শৈবলিনী তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত হইল না। যুবক সন্নিকটে দাঁড়াইয়া শৈবলিনীর সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত গণ্ডস্থলে শত চুম্বন প্রদান করে—তাহার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়। কিন্তু যুবক সাহসী হইল না—মায়ের কঠোর আজ্ঞা। সে শুদ্ধ নিকটে দাঁড়াইয়া তৃষিত চাতকের মত শৈবলিনীর রূপসুধা পান করিয়া নিজের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে লাগিল। যুবক ভাবিতেছিল, শৈবলিনীর এত রূপ—এত সৌন্দর্য্য! এ স্বর্গ-পারিজাত কি এমনিভাবে অনাদৃত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইবে?

করুণাভরা একটা কোমল দীর্ঘশ্বাস শৈবলিনীর অঙ্গে আসিয়া লাগিল—তাহার প্রাণ যেন পুলকে ভরিয়া গেল। তাহার চিন্তা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—সে মাথা তুলিয়া চমকিত হইয়া দেখিল, যেন শত জন্মের সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহার ইষ্টদেবতা সশরীরে তাহার পার্শ্বে সহাস্যবদনে দণ্ডায়মান। শৈবলিনীর ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া

ইষ্টদেবতার চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া নারীজন্ম সার্থক করে—যুবকের ইচ্ছা হইল, দুই বাহু তুলিয়া বালিকাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া উধাও হইয়া উড়িয়া যায়। হর্ষ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শৈবলিনী উঠিয়াও উঠিতে পারিতেছিল না—যুবক আবেগভরে ছুটিতে গিয়াও ছুটিতে পারিতেছিল না—যেন পশ্চাৎ হইতে লজ্জা ভয় ও সঙ্কোচের একটা প্রবল আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল।

সহসা কক্ষের বাহিরে কাহার কণ্ঠের সাড়া পাইয়া যুবক ভীত চমকিত হইল। অমনি সে করুণ দৃষ্টিতে শৈবলিনীর মুখের দিকে তাকাইল। তাহার পর, সুন্দর আননে মৃদুহাস্যের রেখা ফুটাইয়া শৈবলিনীর বিশুষ্ক হৃদয়ে সুধার ধারা ঢালিয়া দিয়া শশব্যস্তে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। যেন ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে সহসা সহস্র বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া লুকাইত হইল—শৈবলিনীর গভীর অন্ধকারময় হৃদয়ের মধ্যে আলেয়ার মত আশার আলো জ্বলিয়া উঠিয়া নির্ব্বাপিত হইল। সে মূর্ত্তি কাহার শৈবলিনী বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছিল—সে মুখ যে তাহার অতি পরিচিত—হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত! কেমন একটা আনন্দ, আশা, অপরিতৃপ্ত লালসা বালিকার হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া তুলিল।

যুবক প্রকাশচন্দ্র কক্ষ হইতে ত্বরিতপদে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল, অমনি সম্মুখে দেখিল, সিংহিনী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা তাহার জননী। জননীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার ভগিনী পুঁটু নতমস্তকে মৃদুহাস্য করিতেছিল—সেই গোয়েন্দাগিরি করিয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলন-সংবাদ তাহার ঘুমন্ত জননীর কর্ণগোচর করিয়াছিল।

হরসুন্দরী সংবাদ শ্রবণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল— সম্মুখে যুবক প্রকাশচন্দ্রকে দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, বেহায়া ছেলে! লজ্জায় ঘৃণায় ম্রিয়মান হইয়া যুবক মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হরসুন্দরী আবার বলিল, শোন্ প্রকাশ! যদি তুই ঐ চামারের মেয়ের সঙ্গে কখনো কথা বলিস্, তুই আমার কুসন্তান। প্রকাশচন্দ্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নতমস্তকে প্রস্থান করিল। হরসুন্দরী লক্ষ্য করিল না, তাহার দুই চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কথাগুলি শৈবলিনীরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। অমনি সে শয্যার উপর শয়ন করিয়া চোখের জলে উপাধান সিক্ত করিয়া মনে মনে বলিল, তবে আর কেন, ভগবান! আমার সকল জ্বালার অবসান কর।

---

(১৫)

যেইমাত্র প্রকাশচন্দ্র চলিয়া গেল, অনুকূলচন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে মাতার সম্মুখে আসিয়া বিরক্তিসূচক বাক্যে বলিল, যদি কথা না কইবে, তবে বিয়ে দিয়েছিলে কেন?

হরসুন্দরী ক্রোধভরে বলিল, বিয়ে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু ও যে চামারের মেয়ে সেটা আগে সন্ধান পাইনি।

অনুকূল বলিল, একটা কচি মেয়ে, তাকে এত জ্বালাতন কেন কর্‌ছ? তার নিজের অপরাধ কি আছে বল ত?

হরসুন্দরী বলিল, সে নিজে অপরাধ না কর্‌লেও তার পিতামাতার অপরাধের শাস্তি তাকেই গ্রহণ কর্‌তে হ'বে।

অনুকূল বলিল, পিতামাতার পাপের শাস্তি যদি সন্তানকে গ্রহণ কর্‌তে হয়, তাহ'লে ভয় হচ্ছে, কতকাল আমাদের অসহ্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'বে!

"তোমরা নরক-যন্ত্রণা ভোগ্ কর্‌বে কেন?"

"তোমাদের মহাপাপের ফলে। একটা নিরপরাধ পরের মেয়ে ঘরে এনে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ—তাকে অবিরত খুঁচিয়ে মার্‌ছ। তার বুকভাঙ্গা যে দীর্ঘশ্বাস উঠ্‌ছে, তাতে সমগ্র সংসার বিষিয়ে উঠ্‌ছে, ঘোষ-পরিবারের শির লক্ষ্য করে' ভগবান বজ্রপাতের উদ্যোগ কর্‌ছেন। যদি তাকে মেরে ফেল্‌তে চাও, এক কোপে কেটে ফেল, না হয়, তাকে খানিকটা বিষ গিলিয়ে দাও। এমন করে' খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে কেন তাকে মার্‌ছ?

পৈশাচিক হাস্য করিয়া হরসুন্দরী বলিল, মরে কই? তাহ'লে ত আবার ছেলের বিয়ে দিতাম, বারো মাসে তের পার্ব্বণের তত্ত্ব বুঝে নিয়ে ঘরে তুল্‌তাম।

উৎকট ঘৃণাভরে অনুকূল বলিল, আগে জান্‌তাম, হাঁসখালির দত্তরা জেলে পাট্‌নী, শুধু মাছ ধরে' খায় কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তারা কসাই—গোখানায় গরু ভেড়া জবাই করা তাদের ব্যবসা।

হরসুন্দরী গর্জ্জন করিয়া বলিল, পাজি! নচ্ছার! মুখ সাম্‌লে কথা বলিস। আমার যা খুসী তাই কর্‌বো, তুই কথা বল্‌তে আসিস কোন্ সাহসে?

অনুকূলচন্দ্রের হৃদয় বিদ্রোহে ভরিয়া গিয়াছিল। সে রুক্ষ মেজাজে উত্তর করিল, কেন সাহস থাক্‌বে না? আমি ত তোমার পিতার অন্নে পালিত হই না?

কালসর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া হরসুন্দরী বলিল, এত স্পর্দ্ধা তোর—তুই যখন তখন আমার 'বাপ মা' তুলে কথা বলিস? তুই যে কার অন্নে পালিত হচ্ছিস, আজ তোকে ভাল করে' মালুম করে'

দেব। বলিয়াই কালসর্পিনী হেলিয়া দুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে পুঁটু দাঁড়াইয়া ছিল। অনুকূল ক্রুদ্ধভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, পুঁটি! যত অনর্থের মুল তুই।

ঘাড় বাঁকাইয়া মুখভঙ্গি করিয়া পুঁটু বলিল, কেন, আমি কি করেছি?

অনুকূল বলিল, তুই কেন দিন রাত্রি গোয়েন্দাগিরি করিস?

পুঁটু বলিল, বেশ করেছি—তুমি আমাকে মার্‌বে নাকি?

অনুকুল বলিল, ইচ্ছা করে, তোর চুলের গোছা ধরে' দুই গালে দুটো চড় বসায়ে দেই।

পুঁটুও সহজ মেয়ে নয়—সে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি আমাকে মার্‌বে কেন বলত? আমি কি তোমার খাই, না, তোমার পরি?

ছোট বোনের মুখে এমন উত্তর শুনিয়া অনুকুলের অত্যন্ত রাগ হইয়া গেল। অনুকুল বলিল, বেহায়া মেয়ে! তোর এত বুকের পাটা হয়েছে, তুই আমার সঙ্গে সমান উত্তর করিস? দাঁড়া তুই, তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি। বলিয়াই যেই অনুকুল অগ্রসর হইল, অমনি পুঁটু কান্নার সুরে চীৎকার করিয়া বলিল, মাগো! আমাকে মেরে ফেল্‌লে গো—বড় দাদা মদ খেয়েছে বুঝি গো! বলিয়াই সে দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

অবিলম্বে বৃদ্ধ নফরচন্দ্র অনুকুলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নফরচন্দ্র বলিল, অনুকুল! এ কি ব্যবহার তোমার?

অনুকুল নতমস্তকে বলিল, কি করেছি বাবা?

"তুমি নাকি তোমার গর্ভধারিণীকে দুর্বাক্য বলেছ ?"

বিরক্তভাবে অনুকূল বলিল, গর্ভধারিণীকে মিষ্ট কথা বল্‌বার সুযোগ পাইনে বাবা !

নফরচন্দ্র বিরক্তভাবে বলিল, ছিঃ ! কোন ভদ্রলোকের সন্তানের মুখে এমন কথা বা'র হওয়া উচিত নয়। তুমি তোমার গর্ভধারিণীর অবাধ্য হয়েছ ?

"হয়েছি।"

"অন্যায়।"

"কিন্তু ন্যায় অন্যায় আজ আপনাকে বিচার কর্‌তে হ'বে বাবা ! একটা পরের মেয়ের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে, হয়ত আপনি সন্ধান রাখেন না ?"

বৃদ্ধ নফরচন্দ্র বলিল, সব সন্ধান রাখি অনুকুল ! কিন্তু ন্যায় অন্যায় বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আজ আমার নাই।

অনুকুল বলিল, কেন নাই ? আপনি কি এ সংসারের কেউ নন্ ?

বৃদ্ধ বিচলিতভাবে বলিল, আমি কেউ নই—আমি 'সাইফার'—শূন্য—ফাঁকা। আমি নাম মাত্র ঘোষ-পরিবারের কর্ত্তা—প্রকৃত কর্ত্রী হচ্ছে, তোমার গর্ভধারিণী—তার আদেশ তোমাকে শুন্‌তেই হ'বে।

অনুকুল উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, এত বড় একটা অত্যাচার চোখের উপর দেখে নীরবে সহ্য কর্‌তে হ'বে ?

নফরচন্দ্র বলিল, 'আল্‌বোথ' কর্‌তে হ'বে। তোমার বাবা যখন জেনে শুনে সব সহ্য কর্‌ছে, তখন তুমি কর্‌বে না কেন ? শোন

অনুকূল! একদিন তোমার পিতা নফরচন্দ্র দাতা, ধার্ম্মিক, ন্যায়বান বলে' খ্যাতি লাভ করেছিল। সে দিন তোমার পিতা আশী বছরের বুড়ো হয়নি, বল-বুদ্ধি হারায়নি, তৃতীয়-পক্ষকে গলার হার করেনি কিন্তু আজ তোমার সেই পিতা পরমুখপ্রত্যাশী জরাজীর্ণ স্থবির—সাইফার—সাইফার। তুমি নতমস্তকে তোমার গর্ভধারিণীর আদেশ পালন কর—তার কাছে ক্ষমা চাও।

মাথা নীচু করিয়া অনুকূল বলিল, পার্‌বো না বাবা!

অমনি হরসুন্দরী বাঘিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ও হতভাগাকে আজই ত্যাজ্যপুত্র কর্‌তে হ'বে। ও আমার মেয়েকে মার্‌তে আসে—আমাকে বাপ মা তুলে গাল দেয়—ওর মুখদর্শন আর কর্‌বো না।

গর্ব্বভরে অনুকল বলিল, বেশ তাই হ'ক, আমি আজই তোমাদের পাপ সংসার ছেড়ে যাচ্ছি। যেখানে এত অত্যাচার অবাধে চলে যাচ্ছে—যেখানে আমার পিতা সাইফার, সে স্থান নরক। বলিয়াই অনুকূল প্রস্থানোদ্যত হইল।

অমনি বৃদ্ধ নফরচন্দ্র বাধা দিয়া বিচলিত ভাবে বলিল, কর কি—অনুকল! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

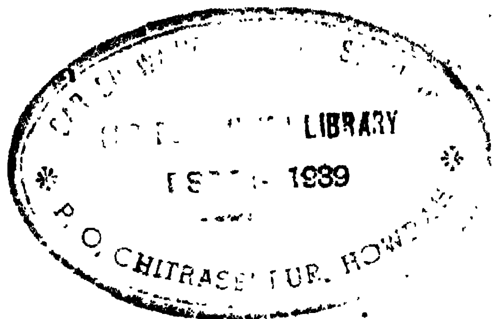
অনুকূল বলিল, আমি মূর্খ পুত্র—পিতৃ-মাতৃদ্রোহী কুসন্তান। আপনার কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র বিদ্বান বুদ্ধিমান বাধ্য সন্তান। আমি আশীর্ব্বাদ করে' যাচ্ছি, সে আপনার বংশের মুখোজ্জ্বল কর্‌বে। বলিয়াই অনুকূল দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধ নফরচন্দ্র বলিল, গৃহিণি! একটু ঠাণ্ডা হও—ছেলেদের সঙ্গে বনিয়ে চল।

হরসুন্দরী ধমক দিয়া বলিল, নেহাত আহম্মুখের মত কথা বল্‌ছ। আমি মা হ'য়ে ছেলের পায়ে ধর্‌তে যাব নাকি? দূর্‌ হ'য়ে যা'ক, ওটা আমার দু'চক্ষের বিষ।

নফরচন্দ্র মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি শুদ্ধ সাইফার—সাইফার।

বলিয়াই বৃদ্ধ মন্থরগমনে প্রস্থান করিল।



(১৬)

শৈবলিনীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়া শঙ্কর চাকর ও পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া হেমবাবু তাঁহার কর্ম্মস্থল সিমলা পাহাড়ে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চিন্তার অবধি ছিল না, কি প্রকারে সেখানে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। পত্নী নাই—বয়স্থা কন্যা শ্বশুরালয়ে। একমাত্র বিশ্বস্ত শঙ্কর চাকরের উপর নির্ভর করিয়া কিছুতেই সংসার চলিতে পারে না। এখন উপায় কি?

হেমবাবু শঙ্করকে ডাকিয়া বলিলেন, শঙ্কর! কি করে' আমার সংসার চল্‌বে?

শঙ্কর ভরসা দিয়া বলিল, ভয় কি বাবু! যে প্রকারেই হউক আপনার সংসার চালিয়ে দেব।

হেমবাবু বলিলেন, তুমি একা কি করে' চালাবে শঙ্কর? আমাকে আফিসে যেতে হ'বে। কে রাঁধবে—বাড়বে—কে ছেলেমেয়েদের দেখ্‌বে? তা ছাড়া আরও অনেক গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্ম আছে।

শঙ্কর মাথা নীচু করিয়া বলিল, সব আমি কর্‌বো।

হেমবাবু শঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, অসম্ভব।

শঙ্কর বলিল, এই অসম্ভবই আমাকে সম্ভব করে' তুল্‌তে হ'বে। শুধু রাঁধবার বাড়্‌বার জন্য একটা ঠিকে বামুন রেখে দিলে হ'বে, আর যত কাজ-কর্ম্ম আছে, সব আমি কর্‌বো।

হেমবাবু বলিলেন, কি বল্‌ছ শঙ্কর! তুমি একা মানুষ—এত কাজ কি করে' কর্‌বে?

শঙ্কর বলিল, আমাকে কর্‌তেই হ'বে—একা আমাকে দশটা হ'তে হ'বে।

হেমবাবু দেখিলেন, শঙ্করের মুখ গম্ভীর—দৃঢ়তাব্যঞ্জক। বিস্মিতভাবে হেমবাবু বলিলেন, কেন বল দেখি, তোমার এত জেদ?

শঙ্কর ধীরভাবে উত্তর করিল, জেদ নয়—আমার উপর হুকুম।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া হেমবাবু বলিলেন, কার হুকুম?

শঙ্কর বলিল, আমার দিদিমণির হুকুম। বাবু! আমি জানি, চারিদিক থেকে আপনি ঋণজালে জড়ীভূত হ'য়েছেন। চাকরী করে' আপনার যে আয় হয়, দাস দাসী পাচক ব্রাহ্মণ রেখে বড়মানুষী চালে চল্‌লে জীবনে আপনি ঋণ শোধ কর্‌তে পার্‌বেন না। কাজেই আজ থেকে আমাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে' আপনাকে ঋণদায় থেকে মুক্ত কর্‌তে হ'বে।

হেমবাবু অবাক হইয়া সেই প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত পরম হিতৈষী ভৃত্যের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। আত্মসংবরণ করিয়া হেমবাবু বলিলেন, শঙ্কর! তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, সে ঋণ ত জীবনে শোধ কর্‌তে পার্‌বো না। তুমি আমার ভৃত্য নও——

শঙ্কর বাধা দিয়া বলিল, না বাবু! আমি আপনার ভৃত্য নই—

আপনার পুত্র। পুত্রের কি কর্ত্তব্য নয়, অসময়ে বিপন্ন পিতাকে সাহায্য করে?

হেমবাবু বলিলেন, পিতারও কি কর্ত্তব্য নয়, পুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য করে? একটা গৃহস্থের সংসারে কত কাজ। সব কাজের দায়ীত্ব যদি একা তোমার ঘাড়ে পড়ে, তোমার হাফ ছাড়্‌বার অবসর থাকবে না। তোমার ন্যায় পরমাত্মীয়ের উপর আমি এত অত্যাচার কি করে' কর্‌বো?

শঙ্কর বলিল, দায়ীত্বের ভারে যদি আমার ঘাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম করে, সে দিন আমি আপনাকে জানাবো, আপনি অধীর হ'বেন না।

শঙ্কর জোর করিয়াই সব দায়ীত্ব ঘাড়ে পাতিয়া লইল। একজন 'ঠিকে' ব্রাহ্মণ ডাকিয়া রন্ধনের ভার তাহার হস্তে দিল, আর সব কাজ-কর্ম্ম সে নিজের হাতেই করিতে লাগিল। সে নিজে বাসন মাজে, জল তোলে, ঘর দ্বার পরিষ্কার করে, ছেলে মেয়ে রাখে, হাট বাজার করে। কোন কাজেই তার ত্রুটি নাই—কিছুতেই তাহার বিরক্তি নাই। দু'দিন পরে হেমবাবু দেখিলেন, একমাত্র শঙ্করের গুণে তাঁহার সংসারে কোন অভাব নাই—কোন বিশৃঙ্খলা নাই। যথার্থ ই আজ যেন এক শঙ্কর দশটা হইয়া কাজ করিতেছে। পত্নী ও কন্যা বর্ত্তমানে তাঁহার সংসাবে যে প্রকার সুব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা ছিল, আজ তাহার কোন অভাব হয় নাই। প্রভুভক্ত শঙ্করের কার্য্যে হেমবাবু মুগ্ধ হইলেন—তিনি ভাবিলেন, শঙ্কর যথার্থ ই আজ পুত্রের কার্য্য করিতেছে।

শঙ্কর কেন এত করিতেছে? সেই যে শৈবলিনী তাহাকে বলিয়া দিয়াছে, আমার বাবাকে যত্ন করো, ভাই বোন্‌দের ভালবেসো, শঙ্কর

সে কথাত ভুলিতে পারে নাই? সে শৈবলিনীকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসে, তাহাই ত আজ প্রাণপাতেও তাহার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। যদি ত্রুটি হয়—শৈবলিনী যদি কৈফিয়ৎ চায়? তার চেয়ে মরণ মঙ্গল।

---

(১৭)

শঙ্কর অতি দরিদ্রের সন্তান। কোন্ পাহাড়ে মুলুকে কুঁড়ে ঘরে তাহার জন্ম হইয়াছিল—জন্মগ্রহণের পরেই অল্পদিনের মধ্যে একে একে জনক-জননী হারাইয়া বসিয়াছিল, তখন তাহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। তাহার অন্য কোন ভাই ভগিনী ছিল না। পিতৃমাতৃহীন হইয়া শঙ্কর এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিল সত্য কিন্তু সেখানে স্নেহ-মমতার মুখ কখনও দেখিতে পায় নাই। অবিরত প্রহার ও তিরস্কার অম্লানবদনে সহ্য করিতে করিতে তাহার জীবনযাত্রার সূত্রপাত হইয়াছিল।

সেই আত্মীয়ের দ্বারে দুই চারি বৎসর অতি কষ্টে কাল কাটাইয়া একদিন সে তাহার খোট্টা আত্মীয়ের প্রচণ্ড চপেটাঘাত গণ্ডদেশে গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল। তখন তাহার বয়স নয় দশ বৎসর মাত্র। বালক শঙ্কর দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া দেশান্তরে উপস্থিত হইল। সে এক কৃষকের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল। সেখানে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য একপাল গরু, ভেড়া ও ছাগল চরাইবার ভার প্রাপ্ত হইল। বালক

সেখানে পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলেও তাহার পশু সঙ্গীগণের সহিত দুই এক বৎসর বেশ মনের আনন্দে কাল যাপন করিল। সহসা একদিন নেক্‌ড়ে বাঘে একটা ছাগল-ছানার ঘাড় ভাঙ্গিবার অপরাধে সে কৃষকের হস্তে উত্তম মধ্যম প্রহারের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

এইরূপে শঙ্কর একদ্বার হইতে অপর দ্বারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ফুটবলের মত পদাঘাত সহ্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সে জীবনে কোন স্থানেই ভালবাসা বলিয়া পদার্থটীর সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই—কঠোর শ্রম ও অত্যন্ত নির্ম্মমতার মধ্যেই সে চির পরিচিত হইয়াছিল—সেই কারণেই তাহার হৃদয় সাহারার মরুভূমির ন্যায় একেবারে নীরস হইয়া গিয়াছিল।

পরিণত বয়সে সহসা একদিন সে হেমবাবুর আশ্রয় পাইল—তাঁহার পত্নী সুরবালা দেবীর ভালবাসা ও মায়া-মমতা পাইয়া তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। এমন জিনিসের আস্বাদ সে জীবনে কখনও পায় নাই—মরুভূমির মাঝখানেও যে মরুদ্যান থাকিতে পারে, সে কল্পনাও করে নাই—পাষাণের বুক চিরিয়াও যে অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতে পারে, সে পূর্ব্বে কখনও অনুমান করে নাই। শঙ্করের হৃদয় যথার্থই গলিয়া গেল—সে সুরবালাকে মা বলিয়া ডাকিতে পাইয়া চির জীবনের অভাব সুদে আসলে পোষাইয়া লইল।

সুরবালার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, শৈবলিনী। দেবকন্যার মত সেই শিশুটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শঙ্করের বুক জুড়াইয়া গেল। সে জীবনে কাহারও ভালবাসা পায় নাই, কাহাকেও ভালবাসিতে শেখে নাই। সিমলার পাহাড়ে আসিয়া সে যথার্থই যেন ভালবাসার স্বর্গরাজ্যে

প্রবেশ করিয়া বসিল। স্থান সুন্দর—আশ্রয় সুন্দর—অধিবাসীরা সুন্দর—শঙ্কর যে দিকে তাকায় সেইদিকেই সৌন্দর্য্যের একাধিপত্য। সেই সৌন্দর্য্যের সাগরে ডুবিয়া সুন্দরী শৈবলিনীকে বুকে ধরিয়া অসুন্দর শঙ্করের মনে-প্রাণেও যেন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—শঙ্কর মুগ্ধ হইয়াছিল।

শঙ্কর হেমবাবুর সদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছিল—সুরবালার স্নেহে মুগ্ধ হইয়াছিল কিন্তু সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিয়াছিল, শৈবলিনীকে—সে যেন ছিল তাহার বুকের রক্ত। আজ শৈবলিনী শ্বশুরালয়ে—শঙ্করের হৃদয় শৈবলিনীর বিরহে বড় কাতর হইয়াছিল। সুরবালা পরলোকে গমন করিলেও বোধ হয় সে এত কাতর হয় নাই। কিন্তু উপায় নাই, শঙ্কর বুঝিয়াছিল, শৈবলিনীর বিরহ-বেদনা তাহাকে অম্লানবদনে সহ্য করিতেই হইবে। কাজেই শঙ্কর বুক বাঁধিয়াছিল, শৈবলিনীর আদেশ পালনের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছিল।

হেমবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বালক সন্তোষকুমার বড় দুরন্ত ছিল—তাহাকে আঁটিয়া ওঠা শঙ্করের দায় হইয়াছিল। মাঝে মাঝে সে শঙ্করকে এত বিরক্ত করিয়া তুলিত যে তাহার ইচ্ছা হইত, বিরাশি সিক্কার চপেটাঘাত চালাইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। অমনি শৈবলিনীর অনুরোধ মনে পড়িত, শঙ্কর নিজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইত, নখের আঁচড়টী পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গে পড়িত না। হেমবাবু নিজেও বালক-বালিকাগণকে শাসনে রাখিবার অবসর পাইতেন না—পাইলেও সেই মাতৃহীনা শিশুগণের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় গলিয়া যাইত—কাজেই তাহাদের শত অপরাধ বরদাস্ত হইয়া যাইত—দিন দিন তাহারাও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিল।

সহসা একদিন হেমবাবু শঙ্করকে বলিলেন, শঙ্কর! ছেলে মেয়েগুলোকে একটু শাসনে রেখো—ওরা যে অধঃপাতে যেতে বসেছে?

শঙ্কর হেমবাবুর মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কি কর্‌বো বাবু! ওরা যে মা-হারা?

হেমবাবু বলিলেন, মা-হারা বলে ওদের মাথা খাওয়ার ব্যবস্থা করা ত ভাল নয়?

শঙ্কর বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, ওরা ত আপনার কাছে কখনও দুরন্তপনা করে না—ওদের যা কিছু উপদ্রব আমার কাছে। আমি ত নীরবে সব সহ্য করি।

হেমবাবু বলিলেন, তুমি সহ্য কর বটে কিন্তু অত্যন্ত প্রশ্রয়ে ওদের যে ইহকাল পরকাল ঝর্‌ঝরে হ'য়ে উঠ্‌ছে।

শঙ্কর রাগিয়া বলিল, ওরা দুষ্ট বলে' আপনি কি বলেন, ওদের পিছনে গুণ্ডা লাগিয়ে দেব? আমি ওদের গায়ে একটা নখের আঁচড়ও দিতে পার্‌বো না, অন্য কেউ যদি ওদের গায়ে হাত দেয়, তাও সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না, তাতে ওদের পরিণাম যা হয়—তাই হ'বে।

হেমবাবু বলিলেন, বেশ! তাই হ'ক, কিন্তু মনে রেখো, দুদিন পরে তোমাকেই আগে এর ফল ভোগ কর্‌তে হ'বে।

"হয়—হ'বে।" বলিয়াই শঙ্কর রাগে গর্‌ গর্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

---

(১৮)

দু'দিন যাইতে না যাইতেই শঙ্কর হাতে হাতে ফল পাইল। বালক সন্তোষ অবাধ্যতার চরম সীমায় উপস্থিত হইল। তাহার অশিষ্ট ব্যবহারে পথের লোক পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। অনেকের অভিযোগ হেমবাবুর কর্ণগোচর হইতে লাগিল, তিনিও মনে মনে বিরক্ত হইতে লাগিলেন, কিন্তু শঙ্করকে মুখ ফুটিয়া আর কোন কথা বলিলেন না।

বালক পাখী মারিবার উদ্দেশ্যে একখানি বড় পাথরের ঢিল ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড অদূরে কর্ম্মনিরত শঙ্করের কপালে সবলে পতিত হইল—শঙ্করের কপাল কাটিয়া দর দর ধারায় শোণিতপাত হইতে লাগিল—সে অব্যক্ত চিৎকার করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। বালক নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিল—তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—নিতান্ত অপরাধীর মত সে ধীরপদে শঙ্করের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বিষণ্নবদনে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শঙ্কর অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিল—বেদনায় তাহার কপাল ফাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু বালকের বিষণ্ন মুখ দেখিয়া অন্তরের ভাব গোপন করিয়া

মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিল। অদূরে বসিয়া হেমবাবু নিজের চক্ষে সে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন—ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জলিয়া উঠিল। তিনি ধৈর্য্যহারা হইয়া একখানি বেত হাতে করিয়া তীরবেগে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং বালকের পশ্চাতে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠোপরি সবলে বেত্রদণ্ড চালনা করিলেন। কটাক্ষ-মধ্যে শঙ্কর বালকের বিপদ বুঝিতে পারিল—সে নিজের ব্যথা ভুলিয়া গিয়া বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে বালকের হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। হেমবাবুর বেত্রাঘাত ব্যর্থ হইল না—সবলে ব্যথিত শঙ্করের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। 'উঃ গেলাম গো!' বলিয়াই শঙ্কর পিঠ বাঁকাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া পড়িল।

হেমবাবু স্তম্ভিত হইলেন—কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিলেন—পুত্রকে শাসন করিতে গিয়া নির্দ্দোষ নিরপরাধ প্রভুভক্ত ভৃত্যকে অকারণে প্রহার করিয়া বসিলেন। প্রহার সামান্য হয় নাই। অত্যন্ত ক্রোধের বশে যে বেত্রাঘাত তিনি করিয়াছিলেন, বালক সন্তোষের কোমল পৃষ্ঠে সে আঘাত পতিত হইলে অস্ত্রাঘাতের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিত না কিন্তু শঙ্করের কঠিন গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তস্রাব না করিলেও অবিলম্বে তাহার পিঠ ফুলিয়া উঠিল। একে কপালের আঘাতে সে যাতনা পাইতেছিল, সে জ্বালা জুড়াইতে না জুড়াইতেই পৃষ্ঠোপরি দারুণ আঘাত পড়িল। যন্ত্রণায় শঙ্করের চোখ ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিল—শঙ্কর কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া হেমবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া জলভরা মেঘে দামিনী বিকাশের মত মুখে হাসি বাহির করিয়া বলিল, বড় বাঁচায়েছি ভাইকে আমার। বাবু! আপনার বড় অন্যায়—কেন আমার ভাইকে মারতে ছুটে এলেন?

হেমবাবু ক্রোধে লজ্জায় ক্ষোভে অভিভূত হইয়া এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহার হাতের বেত খসিয়া ভূতলে পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, শঙ্কর!

শঙ্কর ব্যথার জ্বালা চাপিয়া রাখিয়া বলিল, কি বাবু!

হেমবাবু বলিলেন, আজ থেকে তোমাকে আমার বাড়ীর চাকরী হ'তে জবাব দিলাম। তোমার পাওনা টাকা কড়ি বুঝে নিয়ে আমার বাড়ী ত্যাগ করে' চলে যাও।

শঙ্কর অবাক হইয়া হেমবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হেমবাবুর কথার অর্থ সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। বিষণ্ণ বিশুষ্ক মুখে শঙ্কর বলিল, আমার অপরাধ কি বাবু?

হেমবাবু বলিলেন, অপরাধ যথেষ্ট। তুমি আমাদের অনেক করেছ, তার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন পুত্র এঁকে দিয়েছে, তোমার কপালে—আর তার নরাধম পিতা আমি এঁকে দিলাম, তোমার পৃষ্ঠে। এখন যাও শঙ্কর! এই পুরস্কার বহন করে' জগতের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও—আমি যে কত বড় ভদ্র আর তুমি কেমন অভদ্র আজ বিচার হ'য়ে যা'ক।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে যে কাজটা হ'য়ে গেল, আপনি তার জন্য এত অধীর হচ্ছেন কেন?

হেমবাবু বলিলেন, না শঙ্কর! আর তোমাকে আমি রাখ্‌বো না— পদে পদে আর তোমাকে এমনভাবে নির্য্যাতন কর্‌বো না। পরের ছেলে তুমি—কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার নিজের ছেলেও বোধ হয় এতটা অত্যাচার নীরবে সহ্য কর্‌তো না। শঙ্কর! বিদায় নাও।

"কোথায় যাব?"

"যেখানে ইচ্ছা।"

"ত্রিসংসারে যে আমার স্থান নাই বাবু!"

হেমবাবু বলিলেন, ভগবানের রাজ্যে যদি পুণ্যের পুরস্কার থাকে, তোমার স্থানের অভাব হ'বে না শঙ্কর!

অমনি শঙ্কর ঘাড় বাঁকাইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, বাবু! আমি কি পুণ্যের পুরস্কারের লোভে আপনাদের এতকাল সেবা করেছি? মূর্খ আমি—ইতর আমি—পাপ-পুণ্যের ধার ধারি না। এককালে আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না কিন্তু কেন যে এতকাল আমি আপনাদের প্রাণভরে সেবা করেছি, জানেন? অমনি শঙ্কর সজলনয়নে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, মা আমার! কোথায় আছ তুমি? শৈবলিনি! দিদি আমার—একবার এসে আমাকে দেখে যাও।

শঙ্কর বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তখন হেমবাবু স্নেহভরে শঙ্করের চোঁখের জল মুছাইয়া দিয়া তাহার হাত ধরিয়া কক্ষ-মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য শয্যায় মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেমবাবু তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া নিজেও চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

---

(১৯)

তাহার পর কিছুদিন গত হইল। একদিন হেমবাবু শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। হাতের কাজ সারিয়া হেমবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া শঙ্কর কাতর কণ্ঠে বলিল, বাবু! দিদিমণির কোন চিঠি-পত্র পেয়েছেন ?

হেমবাবু বলিলেন, না শঙ্কর! এত দিন হ'য়ে গেল সে ত একখানাও পত্র লেখে না।

শঙ্কর যেন ক্রন্দনের স্বরেই বলিল, কেন লেখে না ? দিদিমণির জন্য আমার প্রাণ যেন থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। কেন এমন হয় বাবু ?

হেমবাবু শঙ্করকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তুমি তাকে বড় ভালবাস, তাই তার অদর্শনে কাতর হ'য়ে পড়েছ।

"চিঠি লেখে না কেন ?"

"কুলবধূ সে—হয়ত সেখানে চিঠি লেখ্‌বার সুযোগ পায় না।"

শঙ্কর বলিল, যদি অনুমতি দেন, আমি ছুটে গিয়ে একবার আমার দিদিমণিকে চোখে দেখে আসি।

হেমবাবু বলিলেন, পাগল! সে কি এখানে। যেতে আস্‌তে কত টাকা ব্যয় হ'য়ে যাবে।

শঙ্কর বলিল, যায় যাবে—টাকার ভাবনা কি! এখনও আমার তহবিলে অনেক টাকা আছে।

হেমবাবু বলিলেন, মিছামিছি এতদূর ছুটোছুটী করে' কাজ কি পাগল! আমি আজই বেহাইকে পত্র দিচ্ছি।

শঙ্কর বলিল, এত দিন কি তাদের কোন পত্র দেন নি?

মাথা নীচু করিয়া হেমবাবু বলিলেন, না।

"কেন?"

"তারা আমার সঙ্গে যে কি ব্যবহার করেছে, তা কি তোমার মনে নাই শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল, তারা যেরূপ ব্যবহার করুক না কেন, সেখানে যে আমার দিদিমণি আছে। মান অভিমান করলে আমার দিদিমণির উপায় কি হ'বে?

হেমবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বেশ! আর আমি কোন অভিমান করবো না—তারা যদি আমাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যায়, তবুও কোন কথা বলবো না। আমি আজই পত্র লিখছি, তুমি অধীর হয়ো না শঙ্কর!

সেইদিবসই হেমবাবু বেহাই নফরচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। শঙ্কর হর্ষভরে নিজেই ডাকঘরে পত্র দিয়া আসিল। পরদিবসই শঙ্কর হেমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু! পত্রের উত্তর এসেছে?

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন, তুমি পাগল হ'লে নাকি! কাল পত্র দিয়েছি, আজ সে পত্র এখনও তাদের হস্তগত হয়নি, উত্তর দেবে কি করে?

"কবে উত্তর আসবে?"

"পত্র পেয়েই যদি উত্তর দেয়, দুই তিন দিন দেরী হ'বে।"

সে দুই তিন পূর্ণ হইতে না হইতেই শঙ্কর হেমবাবুকে দশ বার তাগিদ করিয়া বসিল। পত্র যথাসময়ে পটলডাঙ্গায় পৌছিয়াছিল এবং তাহা হরসুন্দরীর হস্তগত হইলেই সে ঘৃণাভরে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। হেমবাবু মনে মনে বড় দুঃখ অনুভব করিলেন, কিন্তু শঙ্করের অধীরতা দেখিয়া তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া শঙ্করের অত্যন্ত তাগাদায় বিরক্ত হইয়া তাহাকে জানাইলেন, পত্রের উত্তর আসিয়াছে, শৈবলিনী ভাল আছে।

হেমবাবু মিথ্যা কথা বলিলেন। কিন্তু শঙ্কর সে কথায় সন্তুষ্ট হইল না। সে বলিল, পত্র দেখি ?

হেমবাবু বলিলেন, পত্র দেখে তুমি কি কর্‌বে ? তুমি ত লেখাপড়া জান না ?

শঙ্কর বলিল, না জানি, তবুও আমি চিঠিখানা দেখ্‌বো।

বিরক্ত ভাবে হেমবাবু বলিলেন, আফিসের ঠিকানায় পত্র এসেছিল— আমি আফিসে ফেলে এসেছি।

শঙ্কর বলিল, কাল পত্রখানা আন্‌বেন—ভুল্‌বেন না ত ?

হেমবাবু বলিলেন, না ভুল্‌বো না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এ পাগলকে বুঝাই কি করে ?

পরদিন তিনি আফিস হইতে বাসায় আসিতেই শঙ্কর প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, বাবু! চিঠি কই ? শঙ্কর তৃষিত চাতকের মত সেই চিঠির আশায় পথ তাকাইয়া বসিয়াছিল। উপায়ন্তর রহিত হইয়া হেমবাবু শঙ্করকে প্রতারণা করিলেন। তাঁহার জামার পকেটে কোন বন্ধু প্রদত্ত ইংরাজিতে লেখা একখানা পত্র ছিল। হেমবাবু সেই পত্র বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে দিলেন।

শঙ্কর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল—তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে পত্রখানা বুকে ধরিয়া পাগলের মত নৃত্য করিতে লাগিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া হেমবাবু অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দ্রুতপদে কক্ষ-মধ্যে চলিয়া গেলেন। হেমবাবু কোন দিনই পটলডাঙ্গার কোন চিঠি-পত্র পাইলেন না কিন্তু মাঝে মাঝে শঙ্করকে যাহা হয় একখানা পত্র দেখাইয়া শান্ত করিয়া রাখিলেন। এইভাবে সিমলার পাহাড়ে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

(২০)

বাড়ীশুদ্ধ লোক শৈবলিনীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছে—হরসুন্দরী দিন রাত্রি তাহাকে গালি-গালাজ করিতেছে কিন্তু এ শাস্তিতেও ঘোষ-গৃহিণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। হরসুন্দরী ভাবিল, এ অতি সামান্য শাস্তি—ঘরের ভিতর দিন রাত্রি বসে থাক্‌বে, রাণীর হালে খাবে পর্‌বে, তাতে ও অভাগার বেটীর কি এত ক্ষতি বৃদ্ধি হ'বে? কাজেই আবার নূতন শাস্তির বিধি-ব্যবস্থা হইল।

হরসুন্দরী শৈবলিনীকে শুনাইয়া ক্ষ্যান্ত দাসীকে ডাকিয়া বলিল, ও ক্ষ্যান্ত! ছোটলোকের মেয়ে দিন রাত্রি ঘরের কোণে বসে থাক্‌বে, কোন কাজ-কর্ম্ম কর্‌বে না, এ ত আমার বরদাস্ত হ'বে না। ওকে তোরা কাজ দে না?

ক্ষ্যান্ত বলিল, আপনাদের রাজার সংসারে কাজ কর্‌বার লোকের ত অভাব নেই। বউমাকে আমরা কি কাজ দেব?

হরসুন্দরী বলিল, ও হ'ল ছোটলোকের মেয়ে—ছোটলোকের মত কাজ ওকে দে—বসে বসে কেন খাবে সে?

ক্ষ্যান্ত বলিল, আপনি বলে' দিন বউমাকে কি কাজ কর্‌তে দেব ?

হরসুন্দরীর হুকুম হইল, আজ হ'তে বাসন মাজা, জল তোলা, ঘর দোর পরিষ্কার করার কাজ ও ছোটলোকের মেয়েকে কর্‌তে হ'বে।

ক্ষ্যান্ত চমকিত হইয়া বলিল, বলেন কি! বড় ঘরের বউ হ'য়ে আপনার সংসারে নূতন বউমা দাসী-গিরি কর্‌বেন ?

হরসুন্দরী বিদ্রুপের হাস্য করিয়া বলিল, ও অভাগী দাসীরও যোগ্য নয়। তোদের তবু একটা জাত-জন্ম আছে, হাতের ছোঁয়া জল লোকে খায় কিন্তু অই মুদ্দফরাসের মেয়ের হাতের জল কে খাবে বলত ? কাজেই ওকে বাইরের কাজ-কর্ম্ম কর্‌তে হ'বে— দরকার হ'লে ধাঙ্গড় মেথরের কাজও ওর ঘাড়ে পড়্‌বে।

ক্ষ্যান্ত দাসী অবাক হইয়া রহিল। এতটুকু বালিকার উপর এত অত্যাচার সে যে দাসী হইয়াও কল্পনা করিতে পারে না। রুষ্টভাবে ক্ষ্যান্ত বলিল, এ আপনার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি মা !

দাসীর মুখে জবাব শুনিয়া হরসুন্দরী ক্রোধভরে বলিল, বাড়াবাড়ি কমাকমি বুঝিনে ক্ষ্যান্তি ! আমি যা হুকুম কর্‌বো, নতমস্তকে সকলকে পালন কর্‌তে হ'বে। যার না পোষাবে, সে পথ দেখ্‌তে পারে। বলিয়াই হরসুন্দরী অন্যত্র প্রস্থান করিল।

ক্ষ্যান্ত দাসীর হৃদয়েও আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল— সে মনে করিল, যখন গতর খাটাইয়া খাইতে হইবে, তখন পথ দেখার ভয় কি আছে। কিন্তু সে তখনই পথ দেখিয়া লইতে পারিল না, কেন না, নূতন বউএর উপর অত্যাচারটা কতদূর গিয়া দাঁড়ায়, তাহাই সে দেখিবার জন্য ঘোষ-গিন্নীর তেজ দম্ভ সহ্য করিয়াই সেখানে পড়িয়া রহিল।

হরসুন্দরীর আদেশ শৈবলিনীর কর্ণগোচর হইয়াছিল—সে আদেশ শুনিয়া সে মর্ম্মাহত হইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিল। হেম-বাবুর আদরের কন্যা সে—যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাহার পিতা বড ঘরে তাহার বিবাহ দিয়াছেন। তাহার পরিনাম এই ঘটিল! আজ তাহাকে বড় ঘরের দোরে দাসী-গিরি করিতে হইবে। কিন্তু উপায় কি আছে? ঘোষ-গিন্নীর আদেশ তাহাকে মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে।

শৈবলিনী উঠিল—একখানি মলিন বসন পরিধান করিয়া নিম্নতলে নামিয়া গেল। রান্নাঘরের বারাণ্ডার উপর বাসনের বোঝা ছিল। বালিকা দুই হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কলতলায় গিয়া নামাইল। দাসীরা চম্‌কাইয়া উঠিল—পরস্পরে মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। রাজরাণী হইয়া আজ চাকরাণীর দলে মিশিয়া কাজ-কর্ম্ম করিবে, এ বড় অত্যাচারের কথা! কিন্তু কে তাহার প্রতিবাদ করিবে? দুঃখে ক্ষোভে দাসীদের বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল—তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সকল দাসী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেহই শৈবলিনীকে বাধা দিতে পারিল না—তাহার হাতের কাজ কাড়িয়া লইতে সাহস করিল না। কিন্তু ক্ষ্যান্ত দাসী স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভাবিল, যদি চাকরী ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার কিন্তু চোখের উপর শৈবলিনীকে কিছুতেই এ ঘৃণিত কাজ করিতে দিবে না।

ক্ষ্যান্ত ছুটিয়া কলতলায় গেল—বাসনের বোঝা তুলিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গিয়া নিজেই বাসন মাজিতে লাগিল। দাসী হইলেও ক্ষ্যান্ত কায়স্থের কন্যা—জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি ছোট কাজ

সে কখনও করিত না। আজ যদি শৈবলিনীকেই সে কাজ করিতে হয়, তবে তাহার করিতেই বা আপত্তি কি? ক্ষ্যান্ত মাথা নীচু করিয়া বাসন আগলাইয়া বসিয়া কাজ করিতে লাগিল। শৈবলিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে দ্বিতলের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—যুবক প্রকাশচন্দ্র। সে স্বচক্ষে তাহার পত্নীর দুরবস্থা দেখিল—যুবকের বুক ফাটিয়া গেল—তাহার চক্ষে জল আসিল। কিন্তু যুবক কোন কথা বলিল না—শুদ্ধ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরপদে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

---

(২১)

দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কলতলার দিকে তাকাইয়া হরসুন্দরী গর্জ্জন করিয়া বলিল, ক্ষ্যান্তি! বড় দরদী হয়েছিস্, দেখ্ছি।

ক্ষ্যান্ত মাথা তুলিয়া বলিল, দরদের কথা কিছু নয় মা! যার কাজ তারই সাজে। আমরা থাক্তে বউমা এ কাজ কর্বেন, চোখে দেখ্তে পার্বো না।

হরসুন্দরী ক্রোধভরে বলিল, বটে! দিন দিন তোর স্পর্দ্ধা বড় বেড়ে গেছে দেখ্ছি। তুই আমার হুকুম অমান্য কর্তে সাহস করিস?

ক্ষ্যান্ত বলিল, হুকুম অমান্য কর্ছি না মা! তবে আমরা থাক্তে যদি নূতন বউমা এই সব নোংরা কাজে হাত দেন, লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়। আপনি বউমার উপর হুকুম করেছিলেন, তিনি আপনার হুকুম মান্য করেছেন। তবে আপনি রাগ কর্ছেন কেন?

ক্যান্ত দাসীর উপর অন্তরে অন্তরে রুষ্ট হইলেও হরসুন্দরী আর কোন উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। দাসী হইলেও হরসুন্দরী তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিত—তাহার একটু দোষ ত্রুটি হইলেও মার্জ্জনা করিয়া লইত। তাহার কারণ, প্রথমতঃ সে স্বজাতির কন্যা—দ্বিতীয়তঃ সে বিশ্বস্তা ও কর্ম্মিষ্ঠা—তৃতীয়তঃ সে এককালে তাহার পরম শত্রু বোস-গিন্নীর খাস চাকরাণী ছিল, অনেক চেষ্টায় তাহাকে 'ফুল্‌সাইয়া' আনিয়াছিল। যদি আজ সে রাগের বশে চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আবার সে বোসেদের বাড়ী ঢুকিয়া বসিবে—তাহার ঘরের অনেক গলদ বোস-গিন্নীকে জানাইয়া দিবে। কাজেই মানের দায়ে হরসুন্দরী ক্যান্ত দাসরীর অবাধ্যতাও সহ্য করিয়া যাইত।

শৈবলিনী এতক্ষণ কলতলায় চুপ্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হরসুন্দরী চলিয়া গেলে, শৈবলিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ক্যান্ত! কেন আমার মান রক্ষার জন্য চেষ্টা কর্‌ছ? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার পিতার ত্রুটিতেই আজ আমার উপর এ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হ'য়েছে। তুমি সরে যাও ক্যান্ত! আমাকে অই হীন কাজ কর্‌তে দাও—আমার বাবার পাপের শাস্তি আমাকেই গ্রহণ কর্‌তে দাও।

ক্যান্ত কোন উত্তর দিল না—সে মাথা নীচু করিয়াই কাজ করিতে লাগিল। একবার সে মাথা তুলিয়া করুণ দৃষ্টিতে শৈবলিনীর মুখের দিকে তাকাইল। শৈবলিনী দেখিল, ক্যান্ত দাসীর দুই চক্ষু হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

হায় রে! দাসীর বুকেও দয়া আছে, মায়া-মমতা আছে কিন্তু ঘোষ-গিন্নীর বুকখানা কি পাষাণের চেয়েও শক্ত? শৈবলিনীর উপর

এ অত্যাচার শুদ্ধ তাহার পিতাকেই অপমান করিবার জন্য, শৈবলিনী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সে বালিকা—বাঙ্গালীর ঘরের কুলবধূ—প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাহার ছিল না—তাহার আত্ম-সম্মানে এত বড় আঘাত লাগিল, তবু সে শ্বাশুড়ীর আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিল না। শৈবলিনী জানিত, যদি সে ঘাড় বাঁকাইয়া জোর করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার শ্বাশুড়ীর এমন সাধ্য হইবে না, যে তাহার দ্বারা এমন হীন কাজ করাইয়া লয়। কিন্তু সে তাহা করিল না—শ্বাশুড়ীর অবাধ্য সে হইল না। তাহার কারণ, সে ভাবিয়াছিল, নিজে অপমানের বোঝা মাথায় পাতিয়া লইয়া তাহার পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

দীন বেশে শৈবলিনী দাসী-মহলে দাঁড়াইয়া আছে, উপর হইতে সুরমা লক্ষ্য করিল। সুরমার ইচ্ছা হইল, নিম্নতলে ছুটিয়া গিয়া শৈবলিনীর হাত ধরিয়া উপরে টানিয়া আনে কিন্তু ক্ষ্যান্ত দাসীর মত প্রকাশ্যভাবে শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাহার সাহস হইল না। যেইমাত্র শৈবলিনী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিল, অমনি সুরমা তাহাকে উপরে উঠিয়া আসিবার ইঙ্গিত করিল।

শৈবলিনী ধীর পদবিক্ষেপে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। হরসুন্দরী উপর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, নবাবীয়ানায় চল্‌বে না—আমার হুকুম শুন্‌তেই হ'বে। ছোট-লোকের মেয়ে ছোটলোকের মতই থাক্‌বে। জল তুলে এনে ওর নিজের ঘর দোর ওকে নিজেই পরিষ্কার কর্‌তে হ'বে।

শৈবলিনীর কান জ্বলিয়া গেল—সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কাহারও বাধা-বিপত্তি শুনিল না—সে ছুটিয়া গিয়া এক বাল্‌তি জল

লইয়া সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে গেল। অপমানে অভিমানে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কয়দিন হইতে তাহার অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল—শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। জল পড়িয়া সিঁড়ির পথ ভিজিয়া গিয়াছিল—জলের ভার লইয়া উপরে উঠিতে গিয়াই তাহার পা পিছলাইয়া গেল, অমনি সে সিঁড়ির উপর পড়িয়া গিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

দাসীরা হায় হায় করিয়া উঠিল—সুরমা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল—হরসুন্দরীর কন্যা উষারাণীও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে ক্ষ্যান্ত দাসী ছুটিয়া আসিয়া শৈবলিনীকে কোলে তুলিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেল। শৈবলিনীকে তাহার কক্ষ-মধ্যে লইয়া গিয়া শয্যার উপর শয়ন করাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে লাগিল। হরসুন্দরী কক্ষ-দ্বারে দাঁড়াইয়া বাঘিনীর মত তাহার দিকে চাহিয়া চোখ 'পাকাইতে' লাগিল।

---

(২২)

"নূতন বউএর ভারি জ্বর হয়েছে—বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে।"

বেলা সাড়ে চারিটার সময় ক্ষ্যান্ত দাসী এই অভূতপূর্ব্ব সংবাদটী কর্ত্তা-গৃহিণীর কর্ণগোচর করিল। সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ নফরচন্দ্রের হস্তস্থিত আলবোলার নল ভূতলে পড়িয়া গেল। কর্ত্তা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিল, য়্যাঁ! বলিস্ কিরে! নূতন বউমার জ্বর হয়েছে? কবে হ'ল?

ক্ষ্যান্ত বলিল, আজ জান্‌তে পেরেছি বাবু! তিন চারি দিন আগে থেকেই বোধ হয় একটু একটু জ্বর হ'ত—আজ জল তুল্‌তে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিল, তারপরই জ্বরটা বড় বেশি হয়েছে।

নফরচন্দ্র বিস্ময়ভরে বলিল, আমার বউমা জল তুল্‌তে গিয়েছিল কেন?

দাসী মাথা নীচু করিয়া বলিল, গিন্নী মার হুকুম হয়েছিল।

নফরচন্দ্র বলিল, তিন চারি দিন আগে থেকেই যদি অসুখ হ'য়ে থাকে, তোরা ভাল করে' সন্ধান নিসনি কেন? তাকে জল তুল্‌তেই বা দিলি কেন?

দাসী বলিল, জ্বর হয়েছিল, কার কাছে সন্ধান নেব? নূতন

বউএর সঙ্গে কথা বলা, তার কাছে যাওয়া পর্য্যন্ত যে বন্ধ। বলিয়াই ক্ষ্যান্ত দাসী চলিয়া গেল।

নফরচন্দ্র অত্যন্ত ভীতভাবে বলিল, কি সর্ব্বনাশ! একটা কচি মেয়ে—তিন চারি দিন জ্বর হয়েছে। তার উপর জল তুল্‌বার হুকুম হয়েছে—পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছে—এখন জ্বরে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে! তার সঙ্গে কথা বলা—কাছে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ। গিন্নি! ব্যাপারখানা কি বলত?

বিরক্তভাবে হরসুন্দরী বলিল, ব্যাপার আবার কি হ'বে—তুমি চুপ্‌ করে' থাক না। বউটা ভারি 'এড়াটে'। এই ঠাণ্ডার দিনেও দু' তিনবার স্নান করে। বোধ হয়, একটু সর্দ্দি জ্বর হয়েছে।

কর্ত্তা বলিল, যে জ্বরই হ'ক, পড়ে গিয়েছিল—ব্যথা পেয়েছে—একটা ডাক্তার ডেকে দেখানো ভাল।

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া নথ নাড়া দিয়া বলিল, সর্দ্দি জ্বরে ডাক্তার দেখাতে হ'বে, তোমার এত টাকা কোথায় আছে? ও চামারের মেয়েটা বাপের বাড়ী থেকে কি দু' পাঁচ হাজার এনেছে?

কর্ত্তা বলিল, তা বলে' কি ঘরের বউ বে-তদ্‌বিরে মারা যাবে?

অমনি হরসুন্দরী মুখ নাচাইয়া বলিল, সে ভাগ্যি আমার হ'ল কই? ম'লে ত বাঁচতাম—ছেলের আবার বিয়ে দিতাম।

কর্ত্তা বিরক্তভাবে বলিল, কি অলক্ষুণে কথা বল্‌ছ গিন্নি? পরের মেয়ের উপর একটু মায়া-দয়া কর্‌তে নেই?

ব্যঙ্গস্বরে গৃহিণী বলিল, বড় দয়া মায়ার শরীর দেখ্‌ছি, যেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! চুপ্‌ করে' থাক না! দু'দিন উপোস দিলেই জ্বর ছেড়ে যাবে।

এমন সময় ক্ষ্যান্ত দাসী আবার ছুটিয়া আসিয়া ভীতভাবে বলিল, ও মা! কি হ'বে গো! বউমা যে আবোল তাবোল বক্‌ছে! বলিয়াই দাসী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভয়ে কর্ত্তার প্রাণ উড়িয়া গেল—ভীতভাবে বলিল, কি সর্ব্বনাশ! কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইল!

হরসুন্দরী বলিল, বক্‌ছে তাতে হয়েছে কি? একটু বাতিক চড়ে' উঠেছে।

কর্ত্তা হতভম্বার মত বলিল, অতটুকু মেয়ের বাতিক চড়ে গেল? সোজা কথা নয় গিন্নি! চল—চল—একবার দেখে আসি। বলিয়াই কর্ত্তা গমনোদ্যত হইল।

অমনি হরসুন্দরী কর্ত্তাকে টানিয়া ধরিয়া বলিল, পাগল হয়েছ? কোথায় যাবে—চুপ্‌ করে বসে থাক।

বিচলিতভাবে কর্ত্তা বলিল, চুপ্‌ করে' থাকি কি করে' গিন্নি! ছেড়ে দাও, একবার আমার বউমাকে দেখে আসি।

ক্রুদ্ধভাবে হরসুন্দরী বলিল, তুমি আমার কথা শুন্‌বে না?

গৃহিণীর চোখরাঙ্গানি দেখিয়া কর্ত্তা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। অমনি নরম সুরে বলিল, শুন্‌বো বই কি! তবে কিনা—

হরসুন্দরী বাধা দিয়া বলিল, কিছু না—কিছু না—তুমি ভেবোনা—ও পোড়াকপালীর কোন অমঙ্গল হ'বে না। বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তাকে জোর করিয়া আবার বসাইয়া দিল।

কর্ত্তা আলবোলার নল হাতে লইয়া দুই একবার তামাক টানিয়া বলিল, যাও না—তুমি নিজে গিয়েই না হয়, খবরটা নাও না।

গৃহিণী বলিল, কার কাছে যাব—কার খবর নেব? সর্ব্বনাশী

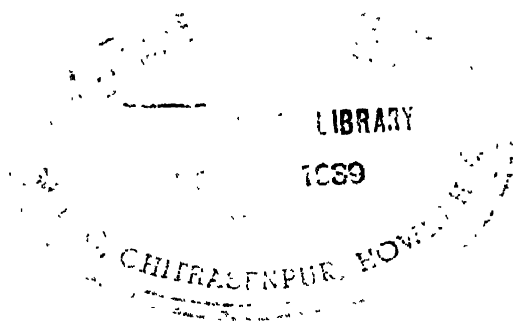
আমার ঘরে এসে আমার জাত গেল, মান গেল, পরম শত্রুর কাছে মাথা নীচু হ'য়ে গেল। আমি ওর মুখদর্শন কর্‌বো না।

"তাহ'লে উপায় কি হ'বে?"

"কোন ভাবনা নেই—ও আপনিই সেরে উঠ্‌বে। ক্ষ্যান্তকে বলে দিচ্ছি, যদি তেষ্টা পেয়ে হা করে, সে ওর গালে জল ঢেলে দেবে। যদি ক্ষিধের কথা বলে, একটু বার্লি রেঁধে দেবে।"

কর্ত্তা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, গিন্নি! তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। তুমিই সব—আমি একটা সাইফার মাত্র।

কর্ত্তা আফিঙের মৌতাতে ঝিমাইতে লাগিল—গৃহিণী কর্ত্তার কথা শুনিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল—যেন ভৈরবের পার্শ্বে চামুণ্ডার অধিষ্ঠান হইল।



(২৩)

প্রকাশচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত যুবক। বি, এ, পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। সে দেখিতে সুন্দর পুরুষ—সচ্চরিত্র সদালাপী—শান্ত শিষ্ট তার প্রকৃতি। মাতার নিষেধ সত্ত্বেও বিবাহিতা পত্নী শৈবলিনীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সে দিন সে লাঞ্ছিত হইয়া যেমন দুঃখিত হইয়াছে, মনে মনে যথেষ্ট লজ্জাও অনুভব করিয়াছে। শৈবলিনীর উপর হরসুন্দরীর দুর্ব্যবহারে অনুকুলচন্দ্র ও তাহার পত্নী সুরমা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। অনুকুল-চন্দ্রই পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্গোপনে স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলন ঘটাইয়াছিল। দিবা দ্বিপ্রহরে হরসুন্দরী যখন নিদ্রা যাইতেছিল, তখন সুরমাই কৌশল করিয়া দেবর প্রকাশচন্দ্রকে শৈবলিনীর কক্ষে গোপনে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যখন গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে না পারিয়া প্রকাশচন্দ্র ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হইল, তখন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া অনুকুল বিদ্রোহী হইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া নিজেও লাঞ্ছিত হইল।

(২৪)

অপরাহ্নে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশচন্দ্র জলযোগের জন্য অন্তঃপুরে সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিল। সুরমা খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিলে প্রকাশ বলিল, বউদি! বড় লজ্জা হচ্ছে, সে দিন নূতন বউএর ব্যাপার নিয়ে বাড়ীতে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। দাদা কেন মার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে গেলেন?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরমা বলিল, তার শাস্তির ব্যবস্থাও হ'য়ে গেছে—রাম-বনবাসের আদেশ হ'য়েছে।

প্রকাশচন্দ্র হাস্য করিয়া বলিল, রামচন্দ্র বনবাসের পরিবর্ত্তে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে উঠে বসেছেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি! সীতাদেবীরও ত সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল? ত্রুটি হ'ল কেন?

সুরমা বলিল, শুদ্ধ একা সীতাদেবীর হয়নি—ভাই লক্ষণেরও ত্রুটি যথেষ্ট।

প্রকাশ বলিল, আমিও কি দাদার সঙ্গে সঙ্গে দাদার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে হাজির হ'ব?

সুরমা বলিল, তাতে দোষ কি? রামের অনুগত ভাই লক্ষণ, তুমি—অন্ততঃ তাঁর তল্পীদার হ'য়ে ত যেতে পার্‌তে?

প্রকাশ বলিল, রামচন্দ্র যে তল্পী-তল্পা ফেলেই পালিয়ে গেছেন। বলত, তোমাকে কাঁধে করে' নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে রেখে আসি।

সুরমা হাসিয়া বলিল, না ভাই! আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না।

প্রকাশ বলিল, কেন?

সুরমা বলিল, তুমি আমাকে রামচন্দ্রের কাছে নিয়ে যাবে কিম্বা বাল্মিকীর তপোবনে রেখে আসবে, কি করে' বুঝ্‌বো?

অমনি প্রকাশ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, কি আমাকে অবিশ্বাস?

সুরমা বলিল, দেবর লক্ষ্মণকে বিশ্বাস করেই ত সীতাদেবীর সর্ব্বনাশ ঘটেছিল। সেইজন্য দেবরজাতির উপর স্ত্রীলোকের ঘোরতর অবিশ্বাস।

প্রকাশ বলিল, তুমি ক্ষেপে গেছ বউদি?

সুরমা বলিল, তোমার দাদা যখন ক্ষেপেছেন, তখন আমার ক্ষেপ্‌তে দোষ কি?

প্রকাশ বলিল, আমার দাদা ক্ষেপেছেন কে বল্‌লে?

সুরমা বলিল, না ক্ষেপ্‌লে কি কেউ বাপ মার সঙ্গে বিবাদ করে' বাড়ী ছেড়ে চলে যায়? তোমার দাদার সব কাজেই বাড়াবাড়ি। এখন আমাকে দিন রাত্রি তোমার মার কাছে মুখনাড়া সহ্য করতে হ'বে—হয়ত ছোট বউএর মত দুর্দ্দশাই আমার কপালে আছে।

ছোট বউএর নাম শুনিয়া প্রকাশচন্দ্র মাথা নীচু করিল—যুবকের হৃদয়ে যেন একটা প্রবল বেদনা উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ মাথা তুলিয়া বলিল, বউদি! শৈবলিনী নেহাত ছেলেমানুষ—সামান্য

একটা তত্ত্বের ব্যাপার নিয়ে মা তার উপর বড় অত্যাচার কর্‌ছেন! তাকে দিয়ে দাসীর কাজও করানো হচ্ছে?

সুরমা দুঃখভরে বলিল, স্ত্রীলোকের উপর শত অত্যাচার হ'লেও তাদের মুখের দিকে তাকাতে সংসারে কেউ নাই ভাই! তোমার মত এমন বিদ্বান গুণবান স্বামী যার, তার যদি আজ এমনিভাবে অত্যাচার সহ্য কর্‌তে হয়, তবে ধিক্ আমাদের নারীজন্মে!

কাতর দৃষ্টিতে সুরমার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রকাশ বলিল, কিন্তু কি কর্‌বো বউদি? আমি যদি স্ত্রীর পক্ষপাতি হ'য়ে দাঁড়াই——

কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়া সুরমা বলিল, তাহ'লে লোকে তোমাকে স্ত্রৈণ বলে' গাল দেবে—লজ্জায় তোমার মাথা নীচু হ'বে, এই ভয় ত? কিন্তু মনে রেখো, শ্বশুর-ঘরে স্ত্রীজাতির একমাত্র বল-ভরসা স্বামী। সামান্য একটা অপবাদের ভয়ে তুমি যদি তোমার চক্ষের সম্মুখে বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর উপর অত্যাচার হ'তে দাও, মাথার উপর ভগবান তোমাকে কি বলে' আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন?

প্রকাশ আবার চিন্তিত হইল—আবার সে মাথা তুলিয়া বলিল, উপায় কি বউদি?

সুরমা বলিল, উপায় তুমি জান, আমি কি পরামর্শ দেব ভাই?

প্রকাশ বলিল, আমি মনস্থ করেছি, শৈবলিনীকে সিমলার পাহাড়ে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেব।

সুরমা বলিল, যার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছ—যাকে চোখে দেখ্‌লেও তোমার অপরাধ হয়, কি করে' তাকে তার পিতার কাছে পাঠাবে? মাতৃভক্ত শান্ত শিষ্ট সন্তান তুমি, কি করে' মার সঙ্গে বিবাদ কর্‌বে?

ঠিক সেই সময়ে ক্ষ্যান্ত দাসী ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, বড়

বউমা! নূতন বউএর ভারি জ্বর হয়েছে—ছট্‌ ফট্‌ কর্‌ছে—উপায় কি?

বিস্মিতভাবে সুরমা বলিল, বল কি ক্ষ্যান্ত!

ক্ষ্যান্ত বলিল, পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়েছিল, তার পরেই কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। এখন দাহ হচ্ছে—ভুল বক্‌ছে। বউমা! কেউ তার সঙ্গে কথা কথা কয় না—কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না—এক ফোটা জলও কেউ তার মুখে দেয় না।

উত্তেজিত কণ্ঠে সুরমা বলিল, কি আশ্চর্য্য! সেই দুগ্ধপোষ্যা বালিকার উপর এত নির্য্যাতন! এ সংসারে কি তার কেউ নাই?

অমনি প্রকাশ চন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে স্থিরকণ্ঠে বলিল, আছে বউদিদি! দু'দিন আগেই থাকা উচিত ছিল, শুদ্ধ লোক-লজ্জার ভয়ে—মায়ের অভিশম্পাতের আশঙ্কায়—এতদিন নীরব থাকতে হয়েছিল। বউদিদি! রাম-বনবাসের আদেশ হ'য়ে গেছে—এইবার লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পালা উপস্থিত। বলিয়াই প্রকাশচন্দ্র দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

---

(২৫)

যুবক প্রকাশচন্দ্র কোন বাধা গ্রাহ্য করিল না। বাঘিনী মূৰ্ত্তিতে জননী বারাণ্ডার উপর ভ্রুকুটী করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, যুবক তাহার দিকে কটাক্ষ-পাতও করিল না। দ্রুতপদে সে শৈবলিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। শৈবলিনী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শরবিদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, প্রকাশ শয্যার উপর উঠিয়া ধীরে ধীরে অতি যত্নের সহিত বনিতার মস্তক আপনার অঙ্কের উপর তুলিয়া লইল। শঙ্কা-কম্পিত হস্তে যুবক তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিল। উঃ! গাত্রে কি প্রচণ্ড উত্তাপ!

প্রকাশ ডাক্তারী পড়ে। পকেটে থার্ম্মোমিটার ছিল—গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ১০৫° ডিগ্রী—প্রবল জ্বর। তাহার উপর কাশি দেখা দিয়াছে। প্রকাশ যন্ত্র দ্বারা রোগিনীর বুক পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ পিঠ ও পিঠ ভাল করিয়া দেখিল। তাহার পর যন্ত্রটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া কপালে হাত দিয়া ভীতভাবে যুবক বলিল, কি সর্ব্বনাশ! নিউমোনিয়া!

প্রকাশের চক্ষে জল আসিল—দুই ফোঁটা অশ্রু শৈবলিনীর সুন্দর মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল। অমনি যুবক বসনাঞ্চলে অশ্রু ফোঁটা মুছিয়া

লইল। এই সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শৈবলিনী প্রলাপ বকিতে লাগিল, মাগো! একটু দাঁড়াও—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, হায়! আর একটু আগে কেন শৈবলিনীকে যত্ন কর্‌লাম না—এমনিভাবে কেন একে বুকে তুলে নিলাম না?

অভাগিনী শৈবলিনী শ্বাশুড়ীর গঞ্জনায় সকলের অনাদরে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল—দুঃখে ক্ষোভে বালিকা মরণ-পণ করিয়া বসিয়াছিল। সে শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে লাগিল। কখন অল্প আহার করিত—কখন অনাহারে কাটাইয়া দিত। ক্রমশঃ শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল—অল্প অল্প জ্বর দেখা দিল—সেই জ্বরের উপরও সে অত্যাচার করিতে ক্রুটী করিল না। দুই বেলা স্নান করিত—আহার করিত—সম্মুখে যাহা কুপথ্য জুটিত, তাহাই খাইয়া বসিত। তাহার পর শ্বাশুড়ীর হুকুমে জল তুলিতে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত পাইল। বালিকার শরীরে এত অত্যাচার সহ্য হইল না—সে প্রবল রোগে আক্রান্ত হইল—তাহাই আজ তাহার জীবন-শঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হইল।

প্রকাশচন্দ্র বুঝিতে পারিল, ষোলআনা অত্যাচার করিয়া স্ব-ইচ্ছায় শৈবলিনী এ কাল ব্যাধি ডাকিয়া আনিয়াছে—সে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। যুবক ভাবিয়া পাইল না, কি প্রকারে তাহার জীবন রক্ষা করিবে।

শৈবলিনী আবার প্রলাপ বলিল, মা! কে আমাকে জোর করে' ধরে' রেখেছে—ছেড়ে দিচ্ছে না। ওগো তুমি কে গো! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও—মার মেয়ে মার কাছে চলে যাই।

আবেগভরে প্রকাশচন্দ্র শৈবলিনীর সংজ্ঞাহীন দেহ বুকের মধ্যে টানিয়া

লইয়া স্নেহভরে তাহার মুখচুম্বন করিল। সে চুম্বনে বোধ হয় সঞ্জীবনী ছিল—শৈবলিনীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সম্মুখে কি দেখিল? দুই দণ্ড পূর্ব্বে যে দেবতার দর্শন লাভ করিবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার সাক্ষাৎ পাইলে সে এ অনন্ত নরকেও স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে পারিত—যাহার মুখের একটা মিষ্ট কথা শুনিতে পাইলে সে বজ্রের আঘাতও অম্লানবদনে বুকে পাতিয়া লইতে পারিত, এ সেই পরমারাধ্য পতি-দেবতা। শৈবলিনী স্বামীকে বিন্দুমাত্র লজ্জা করিল না—সে বোধ হয় ভাবিয়াছিল, তাহার জীবনে এমন দিন আর ঘটিবে না। তাহাই সে মুখ ফুটিয়া বলিল, এসেছ—আবার দেখা দিয়েছ? দু'দিন আগে যখন এসেছিলে, তখন যদি এমনি ভাবে বুকে তুলে নিতে, তাহ'লে আমি মর্‌তাম না।

প্রকাশের চক্ষে জল আসিল—সে মাথা নীচু করিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। শৈবলিনী আবার বলিল, তুমি কেঁদোনা—চোখের জল ফেলে না—শ্রাবণের বারিধারা ঢেলে দিলেও আর আমাকে বাঁচাতে পার্‌বে না। আমি মর্‌ছি—ইচ্ছা করেই মর্‌ছি—বড়ঘরের মানের দাবীতে আমার জীবন বলিদান কর্‌ছি। কত দিন এসেছি, একটা মুখের কথাও কেউ আমার সঙ্গে বলে নি—পেট পূরে এক দিনও খেতে পাইনি। কত দুর্ব্বাক্য কানে শুনেছি, তাই মর্‌বার জন্য আকুল হ'য়ে শরীরের উপর শত অত্যাচার করেছি। আজ আমাকে যমে ধরেছে—মা ডাক্‌ছে—আমি যাই।

দুর্ব্বল শরীরে আবেগভরে এতগুলি কথা বলিয়া শৈবলিনা আবার সংজ্ঞা হারাইল। প্রকাশ উঠিয়া শৈবলিনীর মাথায় জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আবার শৈবলিনীর চৈতন্য হইল—সে দেখিল, প্রকাশ তখনও তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সেবা

করিতেছে। শৈবলিনী বলিল, তুমি এখনও এখানে বসে আছ? চলে যাও। মা দেখ্‌লে গাল-মন্দ দেবেন।

প্রকাশচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, অমনি শৈবলিনী তাহার রুগ্ন কম্পিত হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রকাশের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমার সঙ্গে কথা কয়ো না—মার আদেশ লঙ্ঘন করো না—তোমার পাপ হ'বে।

প্রকাশ কোন কথা না বলিয়া কাতর দৃষ্টিতে শৈবলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। অমনি শৈবলিনী প্রকাশের হাতখানি ধরিয়া নিজের কপালের উপর রাখিয়া বলিল, কেঁদোনা তুমি—আমার সঙ্গে ছুদিনের দেখা—ছু'দিনে সাঙ্গ হ'য়ে গেল। আমার বাবা যখন ছুটে এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, আমার শৈবলিনী কই? তখন তুমি তাঁকে বলো, মার মেয়ে মার কাছে চলে গেছে। আমার ভাই বোনগুলো যখন কেঁদে বুক ভাসাবে, তখন তাদের বলো, তোদের দিদি জন্মের মত বিদায় হয়েছে। কিন্তু আমার শঙ্কর দাদা যদি আসে, সে যে পাগল হ'য়ে যাবে—তুমি ত কিছুতেই তাকে শান্ত কর্‌তে পার্‌বে না?

শৈবলিনীর কাতর খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রকাশচন্দ্রের বুক ফাটিয়া গেল—সে শৈবলিনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

---

(২৬)

শৈবলিনী আবার অচৈতন্য হইল। প্রকাশচন্দ্র শৈবলিনীর সংজ্ঞাহীন দেহ শয্যার উপর রাখিয়া উত্থিত হইল। শৈবলিনীর কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রকাশচন্দ্র দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল। গৃহে কয়েকটী বাক্স ছিল। যুবক একটী বাক্স খুলিয়া নিজের সোনার ঘড়ি, চেইন, বোতাম, হীরকাঙ্গুরীয় বাহির করিল। সে গুলি বস্ত্র-মধ্যে লুক্কাইত করিয়া প্রকাশচন্দ্র দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

হরসুন্দরী দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুকুলচন্দ্র অবাধ্য ছিল বলিয়া ঘোষ-গিন্নী তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র বিদ্বান, বিনয়ী ও মাতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত সন্তান—সে কখনও তাহার অবাধ্য হয় নাই—মুখ তুলিয়া কখনও উচ্চ কথাটী বলে নাই। আজ সেই প্রিয় পুত্র যখন বাধ্যতার গণ্ডী পার হইয়া মাতার বিরুদ্ধাচরণ করিল, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া—নিষেধ অমান্য করিয়া স্বীয় পত্নীর সেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল, তখন হরসুন্দরীর হৃদয় ক্রোধে

অভিমানে ও অপমানে ভরিয়া গেল। মূর্খ পুত্র অনুকুলচন্দ্রের অবাধ্যতা তাহাকে তত ব্যথা প্রদান করিতে পারে নাই, কৃতবিদ্য সন্তান প্রকাশচন্দ্রের এ প্রকার অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য তাহার হৃদয়ে যে প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত করিয়াছিল।

রোষভরে গম্ভীরভাবে হরসুন্দরী কন্যা উষারাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটু! প্রকাশ চলে গেছে?

কন্যা বলিল, গেছে মা!

"কোথায় গেছে, জানিস্?"

"বোধ হয়, ডাক্তার ডাকতে গেছে।"

রোষভরে হরসুন্দরী বলিল, ডাক্তার ডাকতে গেছে! টাকা খরচ করতে হ'বে, অই পোড়াকপালীর জন্যে! এত বাড়াবাড়ি আমার বরদাস্ত হ'বে না পুঁটু!

আদরের মেয়ে পুঁটু—এতকাল সে মার মন যোগাইয়া আসিয়াছে—নূতন বউএর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করিয়াছে কিন্তু আজ যেন তাহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাই সে বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমারও ত বাড়াবাড়ি নেহাত কম নয় বাপু!

বিস্মিতভাবে আদরের কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া হরসুন্দরী বলিল, বলিস্ কি পুঁটি! আমার বাড়াবাড়ি কিসে দেখ্‌লি?

আদর পাইয়া পুঁটুর বুকে স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছিল। বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া সে বলিল, বাড়াবাড়ি নয়? একটা তত্ত্বের ব্যাপার নিয়ে তুমি ঘরের বউএর উপর কত অত্যাচার করছ, বল দেখি? আজ সে মরতে বসেছে, তবুও তোমার আশা মেটে না। তোমার বুকে কি বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা নাই মা?

এত বড় কথা আজ আদরের মেয়ের মুখে শুনিতে হইল! আঘাত পাইয়া কালসর্পিনী যেমন গর্জ্জন করিয়া ওঠে, তেমনিভাবে হরসুন্দরী চোখ রাঙ্গাইয়া আদরের মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, পুঁটি! তুইও ওদের দলে মিশে গেছিস্ বুঝি?

পুঁটু বলিল, অত শত দলাদলি আমি বুঝিনে। তোমার কথা শুনে এ যাবৎ আমি কত অন্যায় কাজ করেছি—ঘরের বউএর বিরুদ্ধে আড়ি পেতেছি—বড় ভাইএর অসম্মান করে' মহাপাপ করেছি। আর তোমার কথা শুন্‌বো না। এখনই আমি নূতন বউএর কাছে যাব—তাকে সেবা কর্‌বো।

ক্রোধভরে হরসুন্দরী বলিল, তুই তার সেবা কর্‌বি?

পুঁটু বলিল, কর্‌বো। শোন মা! সে দিনের কথা মনে হ'লে এখনও দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। নূতন বউদিদি একটা মুখের কথা শোন্‌বার জন্য আমার হাত ধরে কেঁদেছিল—কত দুঃখের কথা আমাকে শোনায়েছিল কিন্তু পাষাণীর মেয়ে আমি তার কথায় কান দেইনি—তার চোখের জল মুছিয়ে দেইনি। ছোট দাদার যখন বিয়ে হয়েছিল, নূতন বউ ঘরে এলে আমি তাকে নিজের বোনের মত ভালবেসেছিলাম। সে যখন পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিল, আমি চোখের জলে বুক ভাসায়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি তোমার পরামর্শ শুনে সেই বউএর উপর কি অত্যাচার করেছি! সে যদি আজ মরে, নরকেও আমার স্থান হ'বে না মা। বলিয়াই চোখে বসনাঞ্চল দিয়া ঊষারাণী কাঁদিয়া আকুল হইল।

কন্যার কথা শুনিয়া হরসুন্দরী চমকিত হইল—সে দেখিল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আজ তাহার বিরোধী হইল—বড় আদরের কন্যাও আজ তাহার কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল। কিন্তু শার্দ্দূল যতই খোঁচা খায়,

ততই গর্জ্জন করিয়া ওঠে—কালসর্পিনী আঘাত পাইয়া মরণাপন্ন হইলেও ফোঁস করিতে ছাড়ে না। হরসুন্দরী রোষভরে বলিল, তুই যদি আমার অবাধ্য হ'স্, তোকে এখনই শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেব।

কন্যা বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া বলিল, সে ভয় দেখাচ্ছ কেন? তাই আমাকে পাঠিয়ে দাও, যেন নূতন বউদিদির মরণ চোখের উপর না দেখ্তে হয়—তোমাদের এ বড় ঘরের ভিটেয় আর যেন আমাকে না আস্তে হয়। বলিয়াই উষারাণী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

---

(২৭)

অনতিকাল পরে একজন খ্যাতনামা ডাক্তার সঙ্গে লইয়া প্রকাশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া যুবক অন্তঃপুরে শৈবলিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল। হরসুন্দরী দূরে দাঁড়াইয়া রোষভরে কম্পিত হইতে-লাগিল। ডাক্তার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল রোগিনীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। তাহার পর, মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, রোগ সাংঘাতিক—ডবল নিউমোনিয়া। পেট ঝাঁপ দিয়েছে—শীঘ্র টাইফয়েড অবস্থা দেখা দেবে। তবে হতাশ হ'বেন না—সুচিকীৎসায় আরোগ্য হ'তেও পারে।

চিকীৎসার ব্যবস্থা করিয়া ষোল টাকা দর্শনী লইয়া ডাক্তার চলিয়া গেল। প্রকাশচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রকাশচন্দ্র উঠিল—রোগিনীর পার্শ্বে গিয়া বসিল—তাহার পরম সুন্দর মুখখানার দিকে অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল। শৈবলিনী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল—ক্রমশঃ সে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল। প্রকাশ মনে মনে বুঝিল, তাহাকে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। তবুও যুবক হতাশ হইল না—বুক বাঁধিল—প্রাণপণে রোগিনীর সেবা করিতে লাগিল।

পূজার তত্ত্ব

গৃহিণী হরসুন্দরা কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরক্তভাবে বলিল, কি এত কঠিন রোগ হয়েছে, যে বড় ডাক্তার ডেকে এনেছিস্ ?

প্রকাশ কোন উত্তর না দিয়া জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। হরসুন্দরী রুক্ষ মেজাজে কঠোর বাক্যে আবার বলিল, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগেনা। তুই কার হুকুমে এত টাকা খরচ কর্‌লি ?

প্রকাশ উদাস নয়নে একবার জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া রোগিনীর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল—সে কতক গলাধঃকরণ করিল—কতক পড়িয়া গেল। হরসুন্দরী আবার গর্জ্জন করিয়া বলিল, যদি তুই আমার অবাধ্য হ'স্, স্পষ্ট কথা বল্‌ছি, তোর স্ত্রীকে নিয়ে এখনই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা।

অত্যন্ত কাতরভাবে প্রকাশচন্দ্র জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া বুকভরা বেদনায় শুদ্ধ একটী কথা উচ্চারণ করিল—মা !

সে মা সম্বোধন শ্রবণ করিলে বোধ হয়, পাষাণ হিমাচলও গলিয়া যাইত—সুমেরু শিখর ভাঙ্গিয়া পড়িত—বজ্রের আগুন নির্ব্বাপিত হইত, কিন্তু ঘোষ-গৃহিণীর অতি কঠিন প্রাণে এতটুকুও ব্যথা লাগিল না। হরসুন্দরী বলিল, কোন কথা শুন্‌তে চাই না—তুই ওঠ।

প্রকাশ আবেগভরা কণ্ঠে উচ্ছ্বাসিত বাক্যে আবার বলিল, মা !

প্রকাশের পাষাণী মা সে কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিল না বটে কিন্তু সহসা কোথা হইতে আর একখানি মাতৃমূর্ত্তি ছুটিয়া আসিয়া স্নেহ-কোমল অতি সুমধুর কণ্ঠে বলিল, ভয় নাই বাবা ! যদি তোমার গর্ভধারিণীর কাছে আশ্রয় না পাও, বিশ্বসংসারে তোমাব মায়ের অভাব হ'বে না।

রমণীর মুখের দিকে তাকাইয়া বিস্মিত স্তম্ভিত ও অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে হরসুন্দরী বলিল, বোস-গিন্নি! তুমি এখানে?

বোস-গিন্নী মহামায়া বলিল, হ্যাঁ! আমিই এখানে। সন্তানের মুখে মাতৃ-সম্ভাষণ শুনেও তোমার পাষাণ বুকে যখন দয়ার সঞ্চার হ'ল না, তখন মাতৃজাতির অপমানের ভয়ে তোমার পরম শত্রু হ'য়েও আজ আমাকে এখানে ছুটে আস্‌তে হ'য়েছে। ঘোষ-গিন্নি! চোখ রাঙ্গাচ্ছ কেন?

হরসুন্দরী বলিল, তোমার স্পর্দ্ধা বড় বেড়েছে দেখ্‌ছি। তুমি আমার ঘরে এসে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে চাও?

মহামায়া ঘৃণাভরে বলিল, তোমাকে ভয় করে' চল্‌বার মত দীনতা আমার নাই। ঝগড়া করাই যখন আমার স্বভাব, তখন আজ তোমার ঘরে বসে' তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে' জয়ী হ'য়ে চলে যাব।

হরসুন্দরী বলিল, বটে! এখনই পুলিশ ডাক্‌বো।

মহামায়া হাসিয়া বলিল, পুলিস ডেকে আমাকে গেরেফতার কর্‌বার আগে তোমার হাতে হাতকড়ি পড়্‌বে। ঘোষ-গিন্নি! একটা নিরাশ্রয় পরের মেয়েকে তুমি কি করে' গুম্ খুন কর্‌ছ, এখনই প্রকাশ হ'য়ে যাবে। সর্ব্বনাশি! বড় ঘরের গিন্নী হ'তে হ'লে যে বড় বুক নিয়ে সংসারে আস্‌তে হয়, সে শিক্ষা তুমি পাওনি। আজ তোমার পরম শত্রু হ'য়েও সেই শিক্ষা তোমাকে দিয়ে যাব। বলিয়াই মহামায়া শৈবলিনীর শয্যার পার্শ্বে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, প্রকাশ! ওঠ বাবা! আমি তোমার মা। তুমি বেটা ছেলে রোগিনীর সেবা কর্‌তে পার্‌বে না—মেয়ের সেবার ভার মায়ের হাতে দাও—তুমি নিশ্চিন্ত হও।

প্রকাশের দুই চক্ষু হইতে তখন দর দর ধারায় অশ্রু নির্গত হইতেছিল। সে দয়াশূন্য মমতাশূন্য স্বীয় গর্ভধারিণীর পার্শ্বে এমন করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি

দর্শন করিয়া বোধ হয় মনে মনে তুলনা করিতেছিল, ভীমবেশা চামুণ্ডার পার্শ্বে শান্তিময়ী জগজ্জননী দেবী দশভুজা—তুফানভরা খরস্রোতা পদ্মা নদীর পার্শ্বে শান্তসলিলা সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা। একই মায়ের দুই মূর্ত্তি—তবে কেন কেহ ভীষণা, কেহ মঙ্গলময়ী অভয়া ?

বোস-গিন্নী প্রকাশের হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহার স্থান নিজে অধিকার করিয়া বসিল। অমনি প্রকাশচন্দ্র বালকের মত মহামায়ার পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন দূরে দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিয়া হরসুন্দরী বলিল, বোস-গিন্নি! তুমি মমতা দেখায়ে আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ ? অপেক্ষা কর, তোমার স্পর্দ্ধা ভেঙ্গে দিচ্ছি—দ্বারবান ডেকে ঘাড় ধরে' তোমাকে বিদায় করছি। সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

---

(২৮)

বৃদ্ধ নফরচন্দ্র আফিং খাইয়া আলবোলার নল হাতে লইয়া তখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে ভাবিতেছিল, দুনিয়ার মধ্যে কে বেশী মমতার পাত্র? বৃদ্ধ ভাবিয়া স্থির করিল, তৃতীয় পক্ষের বনিতার মত আদরিণী ত্রিসংসারে কেউ নাই। আহা! গৃহিণী যখন গজেন্দ্রগমনে ধরিত্রীর বুক কাঁপায়ে সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হয়, কণ্ঠবীণার ঝঙ্কার তুলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করে, তখন ইচ্ছা হয়, ভগবান ভবানীপতির মত ভৈরবীর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে মানব-জন্ম সার্থক করি। ঠাকুর দেবতার মধ্যে মহাদেব ঠাকুরটী যে সর্ব্বাপেক্ষা সুরসিক ও প্রেমিক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেষ্ট ঠাকুরটীও প্রেমিক মন্দ নয়, তবে তার লুকোচুরী ব্যবসা। মহাদেব ঠাকুরটী কিন্তু একেবারে বম্ ভোলানাথ। তার কারণ, মহাদেবের নেশা করা অভ্যাস আছে, কেষ্ট ঠাকুর সে রসে বঞ্চিত।

ঠিক সেই সময়ে হরসুন্দরী দ্রুতপদে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, বলি হ্যাঁ গা! তুমি বেঁচে আছ, না মরেছ?

আবার বৃদ্ধের ভাবনা উপস্থিত হইল, আমি মৃত কি জীবিত। পুরোদস্তর যে জীবিত নই, সে আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। কেননা, যে বেঁচে থাকে, সে ত আমার মত দিন রাত্রি ঝিমিয়ে কাল কাটায় না। নেশাখোরের পক্ষে মরা বাঁচা সমান দশা।

আবার ঝঙ্কার উঠিল, বলি আমার কথা কানে ঢুক্‌লো না বুঝি ?

বৃদ্ধ অমনি হাতের নল মাটীতে ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, ঢুকেছে—ঢুকেছে। কানের ভিতর ঢুকে মাথার ভিতর গুল্‌জার কর্‌ছে, কিন্তু তার মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে গিন্নি !

বিরক্তভাবে হরসুন্দরী বলিল, বলি, তুমি মরেছ ?

নফরচন্দ্র বলিল, তা যদি মর্‌তাম, তাহ'লে গা-ভরা গহনা পরে কালা পেড়ে সাড়ীর বাহার দিয়ে কি হাত নেড়ে কথা বল্‌তে, না একাদশীর দিনে আকণ্ঠ ভোজন কর্‌বার অধিকার পেতে ? আমি আধমরা হ'য়ে বেঁচে আছি।

গৃহিণী বলিল, যদি বেঁচে থাক, তোমার সংসারে এত অত্যাচার কেন বলত ?

নফরচন্দ্র বলিল, কি আশ্চর্য্য ! তোমার মত গৃহিণী বেঁচে থাক্‌তে আমার সংসারে অত্যাচার ?

হরসুন্দরী বলিল, আমার গৃহিণীপনা আর কেউ মানে না গো ! তোমার বড় ছেলে অবাধ্য হ'য়ে বাড়ী ছেড়েছে—ছোট ছেলেটাও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—পোড়ারমুখী পুঁটি মেয়েটাও আজকাল কথার কামড় দিতে শিখেছে।

নফরচন্দ্র বলিল, ব্যাপার এতদূর পর্য্যন্ত গড়ায়েছে ? আমি আফিংখোর মানুষ—কোন খবর রাখিনে। কিন্তু গিন্নি ! তোমার ছোট ছেলে প্রকাশচন্দ্রটী ত বেশ শান্ত শিষ্ট ?

গৃহিণী বলিল, শান্ত শিষ্ট হ'লে কি হয়, সে কার পরামর্শ পেয়েছে, আমার আদেশ অমান্য করতে শিখেছে। এইমাত্র সে হতভাগা কতকটা টাকা ব্যয় করে' একটা বড় ডাক্তার ডেকে এনেছে।

বিস্মিতভাবে নফরচন্দ্র বলিল, ডাক্তার ডেকে এনেছে কেন?

বিরক্তভাবে গৃহিণী বলিল, জান না—নূতন বউটার 'ব্যাদ্দি' হ'য়েছে, সে নাকি মর্‌তে বসেছে।

বৃদ্ধ নফরচন্দ্র লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, বল কি গিন্নি! মর্‌তে বসেছে?

গৃহিণী বলিল, ভয় নেই—মর্‌বে না—মর্‌বে না। সে যদি মর্‌বে ত আমাকে হাড়ে মাসে জ্বালাবে কে? তারপর, শোন।

"কি?"

"পরম শত্রু বোস-গিন্নীর কি এত মাথা ব্যথা পড়েছে যে আমাদের অন্দরে ঢুকে কোমর বেঁধে ঝগড়া কর্‌তে এসেছে?

চমকিতভাবে হরসুন্দরীর মুখের দিকে তাকাইয়া নফরচন্দ্র বলিল, বল কি গিন্নি! বোস-গিন্নী আমাদের বাড়ীতে এসেছেন? কোথায় তিনি? হরসুন্দরী বলিল, তোমার নূতন বউমাকে কোলে করে' সেবা কর্‌তে বসেছে। যাদের ছায়া মাড়াইনে, তাদের স্পর্দ্ধা দেখ—বাড়ীর উপর চড়োয়া হ'য়ে শত্রুতা কর্‌ছে—কলিকাতা সহরের বুকের উপর দিনে ডাকাতি হচ্ছে। তুমি এখনও চুপ্‌ করে' আছ?

নফরচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি কর্‌বো বল?

হরসুন্দরী বলিল, দ্বারবান ডাকো—গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বাড়ীর বা'র করে' দাও।

গম্ভীরভাবে নফরচন্দ্র বলিল, গিন্নি! চুপ্‌ কর।

রোষভরে হরসুন্দরী বলিল, চুপ্‌ কর্‌বো কেন?

পূজার তত্ত্ব

নফরচন্দ্র বলিল, আমার পরম সৌভাগ্য যে বোস-গিন্নী আজ আমার ভিটায় পদার্পণ করেছেন।

ঘাড় বাঁকাইয়া হরসুন্দরী বলিল, বল কি তুমি?

নফরচন্দ্র বলিল, সত্য কথাই বল্‌ছি—বোস-গিন্নীর মর্য্যাদা তুমি কি বুঝ্‌বে? কায়স্থ কুলের শিরোমণি সুবিখ্যাত রাজার ঘরে তাঁর জন্ম—পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বোস-জমিদারের কুলবধূ তিনি। গিন্নি! এত নিকটে বাস কর্‌ছি, কিন্তু এ যাবৎ সাধ্য হয়নি, বোস-গিন্নীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে' এনে পৈত্রিক ভিটা ধন্য করি। আজ তিনি উপযাচক হ'য়ে আমার বাড়ীতে এসেছেন, এখনও তুমি তাঁর পায়ের তলায় মাথা নীচু করনি?

গর্ব্বভরে মাথা উচু করিয়া কর্কশ-কণ্ঠে হরসুন্দরী বলিল, কি—এত বড় কথা! আমি বোস-গিন্নীর পায়ের তলায় মাথা নীচু কর্‌বো? মনে রেখো, আমিও জমিদারের মেয়ে—আমিও পটলডাঙ্গার ঘোষ-জমিদারের কুলবধূ।

নফরচন্দ্র বলিল, তোমার বুকে যত অভিমান থা'ক না কেন, বোস-গিন্নী মান-মর্য্যাদায় তোমার চেয়ে ঢের বড়।

হরসুন্দরী বলিল, সে বড় হয়, তুমি তার পা-পূজো করগে—কিন্তু আমার এ উচু মাথা কখনো নীচু হ'বে না—শ্মশানে গিয়ে যখন পুড়্‌বো, তখনও আমার মাথা এমনিভাবে উচু থাক্‌বে। বলিয়াই হরসুন্দরী স্বামীর দিকে রোষভরে তাকাইয়া মাথা উচু করিয়া গর্ব্বভরে চলিয়া গেল।

---

(২৯)

যখন বড় ডাক্তার আসিয়া শৈবলিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেল, রোগিনীর জীবনের আশা অল্প, তবে ভালরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিলে জীবন রক্ষা হইতেও পারে, তখন ক্ষ্যান্ত চাকরাণীর বুকে বড় ব্যথা উপস্থিত হইল। সে শৈবলিনীকে বড় ভালবাসার চক্ষে দেখিয়াছিল। তাহার জীবন রক্ষার জন্য সে আকুল হইয়া পড়িল। ভালরূপ সেবা করা চাই কিন্তু উপায় কই? কে অভাগিনী বালিকাকে সেবা করিতে সাহস করিবে? প্রকাশচন্দ্র প্রাণপণে পত্নীর সেবা করিবে বটে কিন্তু সে যুবাপুরুষ—রোগিনীর সেবা তাহার দ্বারা নিতান্ত অসম্ভব। ক্ষ্যান্ত ছুটিয়া বড় বধূ সুরমার কাছে গেল কিন্তু সুরমা জানাইল, শ্বাশুড়ীর অবাধ্য হইয়া শৈবলিনীকে সেবা করিতে গেলে তাহার নিস্তার থাকিবে না। তখন নিরুপায় হইয়া ক্ষ্যান্ত দাসী গুপ্তভাবে অন্তঃপুরের পথে বোসবাবুদের অন্দরে প্রবেশ করিল।

ক্ষ্যান্ত দাসী বোস-গিন্নীকে ভালরূপ চিনিত—তাহার অন্তর জানিত। সে যখন মহামায়ার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তখন বোস-গিন্নী বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, ক্ষ্যান্ত যে! পথ ভুলে আমাদের অন্দরে ঢুকে বসেছিস্ নাকি?

অমনি ক্ষ্যান্ত ছুটিয়া গিয়া বোস-গিন্নীর পা জড়াইয়া ধরিয়া সজল-নয়নে বলিল, মা ! রক্ষা করুন।

অত্যন্ত বিস্ময়ভরে মহামায়া বলিল, সে কি ! কি হয়েছে তোর ? মহামায়া বুঝিল, হয়ত কোন অপরাধে ঘোষ-গিন্নী তাহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই সে তাহার আশ্রয় লইতে আসিয়াছে।

ক্ষ্যান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার কিছু হয়নি মা !

"তবে কার কি হয়েছে, বল্ না ?

ক্ষ্যান্ত চোখে বসনাঞ্চল দিয়া বলিল, মা ! ঘোষেদের নূতন বউমা যে মারা যায় ?

চমকিতভাবে মহামায়া বলিল, বলিস কি ! কি হয়েছে বউমার ?

শৈবলিনীর উপর হরসুন্দরীর অত্যাচারের কথা মহামায়া পূর্ব্বে শুনিয়াছিল। আজ ক্ষ্যান্ত দাসী আছোপান্ত তাহার নিকট বর্ণনা করিল। শুনিয়া, মহামায়া শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মহামায়া বলিল, ক্ষ্যান্ত ! ঘোষেদের সঙ্গে আমাদের বনিবনাও নাই—বিশেষতঃ ঘোষ-গিন্নী ভীষণা রমণী। আমি কি করে' বউমাকে রক্ষা কর্‌বো ?

ক্ষ্যান্ত বলিল, মা ! আপনি ভিন্ন কারো সাধ্য নাই, অভাগিনী নূতন বউমাকে রক্ষা করে। তাই অন্য উপায় না দেখে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

মহামায়া বলিল, ক্ষ্যান্ত ! ঘোষেদের সংসারে এত লোক থাক্‌তে নূতন বউএর জন্য তোর কেন মাথা ব্যথা পড়ে গেল বল দেখি ?

ক্ষ্যান্ত বলিল, বল্‌তে বুক ফেটে যায়। যখন আমি নূতন বউমাকে

আনতে ভবানীপুর তার বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম, আমি সামান্ত দাসী হ'লেও বউমার বাপ আমার তুখানি হাত ধরে' কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, ক্যান্ত! মায়ের শোকে আমার শৈবলিনী পাগলিনী হয়েছে—সে বুকে বড় ব্যথা পেয়েছে। তোমরা আমার মাকে যত্ন করো—সে যদি কাঁদে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করো। বউমার বাপের সে করুণ কান্নার কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজ্‌ছে—তাঁর প্রত্যেক কথাটী আজ আমার বুকে শেলাঘাত কর্‌ছে। মাগো! ঘোষ-গিন্নীর ভয়ে আমি ভদ্রলোকের সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি—দুঃখে ক্ষোভে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

ক্যান্ত দাসীর কথা শুনিয়া মহামায় কোমল হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগিল—তাহার চোখের কোনে অশ্রু দেখা দিল। মহামায়া উঠিল—অবিলম্বে বোস-কর্তা প্রসন্নবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল।

প্রসন্নবাবু বলিলেন, তুমি কি কর্‌তে চাও?

মহামায়া বলিল, আমি এখনই ঘোষেদের বাড়ী যাব—বউমাকে সেবা-শুশ্রূষা করে দেখ্‌বো, যদি তার জীবন রক্ষা কর্‌তে পারি।

প্রসন্নবাবু বলিলেন, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ সত্য কিন্তু আহ্বান করে' যারা তোমাকে পায় না, তুমি অনাহূত ভাবে তাদের বাড়ীতে যেতে চাও?

মহামায়া বলিল, কর্ত্তব্য পালনের গুরুত্ব যেখানে বেশী, সেখানে মান-মর্য্যাদার দাবী চলে না। তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

প্রসন্নবাবু বলিলেন, এ যাবৎ তাদের সঙ্গে রেষারেষি চলে আসছে। যদি তারা তোমাকে অপমান করে।

মহামায়া বলিল, একটা অত্যাচারের আগুন যেখানে জ্বলে উঠেছে, সেটা নিভাতে গেলে সেখানে আগুনের সেক গায়ে লাগ্‌বে বই কি! তাতে ভয় কর্‌লে ত চল্‌বে না?

প্রসন্নবাবু মহামায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার অদ্ভুত প্রকৃতি! যে ঘোষেদের নাম শুন্‌লে তুমি রাগে জ্বলে ওঠ, যাদের ছায়া মাড়াতে তুমি ঘৃণা কর, তাদের বিপদে আজ তুমি মান-অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের বাড়ী ছুটে চলেছ?

মহামায়া বলিল, যদি ঘোষ-গিন্নীর কোন বিপদ উপস্থিত হ'ত, এতটা উদারতা দেখাবার শক্তি আমার হ'ত কি না বল্‌তে পারি না। কিন্তু একটা পরের মেয়ে—নিরীহ বালিকা অত্যাচারের আগুনে পুড়ে মর্‌ছে—তাকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত আছি। শোন, যদি আমার সংকল্প সাধু হয়, ঘোষ-গিন্নীর সাধ্য কি আমাকে অপমান করে? আমি চল্‌লাম।

প্রসন্নবাবু বলিলেন, একা যাবে?

মহামায়া বলিল, নির্ম্মলকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

নির্ম্মলচন্দ্র প্রসন্নবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র—প্রকাশের সহপাঠী বন্ধু। দুই পরিবারে বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলেও তাহারা পরস্পরে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ক্ষ্যান্ত দাসী পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিল। পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহামায়া পশ্চাতে ঘোষেদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

---

(৩০)

বোস-গিন্নী মহামায়া শৈবলিনীর সেবার ভার গ্রহণ করিল। প্রকাশ মহামায়ার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে তাহার সহপাঠী নির্ম্মলচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, প্রকাশ! অধীর হয়ো না—মার হাতে সেবার ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও। প্রকাশকে লইয়া নির্ম্মলচন্দ্র কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

মহামায়া শৈবলিনীর রোগ-শীর্ণ অবসন্ন তনু একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাহার পর, তাহার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, বউমা! মা আমার—একবার কথা কও।

সে কি সুমিষ্ট স্বর! সে কি করুণ কান্নায় ভরা বেহাগের বাঁশী! সেই স্বর্গীয় স্বর শৈবলিনীর মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চার করিল। শৈবলিনীর সর্ব্বাঙ্গ স্বর্গীয় পুলকে শিহরিয়া উঠিল। সে যে অনেক কাল হইতে সোহাগে বঞ্চিত হইয়া আছে—এতকাল যে বিশ্বসংসার তাহার

কর্ণে নীরব হইয়া আছে! সহসা সুমধুর সম্বোধনে সে চমকিত হইয়া উঠিল—সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিল, এক দেবী-মূর্ত্তি তাহাকে স্নেহের অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে মহামায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া শৈবলিনী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, কে তুমি মা?

শৈবলিনীর বিশুষ্ক গণ্ডে স্নেহভরে চুম্বন প্রদান করিয়া মহামায়া বলিল, আমি তোমার মা।

শৈবলিনীর গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। মহামায়া বসনাঞ্চলে শৈবলিনীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া স্নেহভরে বলিল, কেঁদোনা মা! রোগ ভাল হ'য়ে যাবে।

শৈবলিনী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, যথার্থই তুমি আমার মা। ঠিক আমার মায়ের মত মুখখানা। মাগো! স্বর্গ ছেড়ে আমাকে কোলে তুলে নিতে এসেছ? এতদিন কেন ভুলে ছিলে? আর যে আমি সহ্য কর‍্তে পারি নে মা?

গণ্ডে চুম্বন করিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া মহামায়া বলিল, চুপ্ কর মা! তুমি ভাল হ'বে।

শৈবলিনী বলিল, বল তুমি আমাকে আর ছেড়ে যাবে না—কোলে করে' স্বর্গে নিয়ে যাবে?

মহামায়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। চোখের জল মুছিয়া শৈবলিনীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মহামায়া বলিল, বউমা! ভুল কর‍্ছ কেন? আমি পাশের বাড়ীর বোস-গিন্নী—চিন্‌তে পার‍্ছ না মা?

শৈবলিনী বলিল, মিথ্যা কথা! তুমি আমার মা। আমার মা ছাড়া সংসারে আর ত কেউ আমার সঙ্গে কথা কইতে সাহস কর‍্বে না?

"কেন ?"

"আমার শাশুড়ীর হুকুম।

"বিশ্বসংসারে সকলেই তোমার শাশুড়ীর হুকুম পালন করবে না মা !"

গ্লাসে পথ্য লইয়া মহামায়া শৈবলিনীর মুখে ঢালিয়া দিতে গেল। শৈবলিনী মুখ ফিরাইয়া বলিল, ও কি ?

"পথ্য—বেদানার রস।"

মাথা নাড়িয়া শৈবলিনী বলিল, খাবো না মা !

"কেন খাবে না ?"

"আমি মর্‌বো—মর্‌তে সাধ হয়েছে। আমি মার মেয়ে মার কাছে যাব।"

শৈবলিনীকে বুকে চাপিয়া রাখিয়া বোস-গিন্নী বলিল, আমি তোমার মা—তুমি আমার কাছে থাকো।

শৈবলিনীর ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তেজনা আসিল। মহামায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া শৈবলিনী বলিল, তুমি যদি আমার মা, তবে এতকাল কোথায় ছিলে ? একটা মুখের কথা শোন্‌বার জন্য আমি এতকাল কাণ খাড়া করে' ছিলাম—একটা মিষ্টি কথা শুন্‌লে আমি আনন্দে গলে যেতাম। কিন্তু পোড়াকপাল আমার ! কেউ আমার মুখের দিকে তাকালে না—চাকর চাকরাণীরাও আমার সঙ্গে একটা কথাও বল্‌লে না। যদি দু'দিন আগে আস্‌তে, এমনি করে' আমাকে বুকে তুলে নিতে, তাহ'লে আমি মর্‌তাম না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহামায়া বলিল, আমি তোমাকে মর্‌তে দেব না।

শৈবলিনী বলিল, বাঁচাতে পার্বে না মা। বাঙ্গালার কত ঘরে এমনিভাবে শ্বাশুড়ীর অত্যাচারে কত বউ মর্ছে, তুমি কজনকে রক্ষা কর্বে মা? তার চেয়ে আমাকে মরতে দাও, আর আশীর্ব্বাদ কর, বড় ঘরের বউ হ'য়ে আর যেন আমাকে সংসারে না আস্‌তে হয়।

অত্যন্ত উত্তেজনায় শৈবলিনী আবার সংজ্ঞা হারাইল—মহামায়ার ছুই চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

---

(৩১)

কণ্ঠের সাড়া দিয়া চটীজুতার শব্দ করিয়া বৃদ্ধ নফরচন্দ্র নিতান্ত পাগলের মত টলিতে টলিতে টলিতে শৈবলিনীর কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। নফরচন্দ্রকে দেখিয়াই বোস-গিন্নী লজ্জিত সঙ্কুচিতভাবে মাথার উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। বৃদ্ধ নফরচন্দ্র বিহ্বলভাবে কক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, বোস-গিন্নি! পরম সৌভাগ্য আমার যে আমার বাড়ীতে আপনার পদধূলি পড়েছে। বোস-গিন্নি! যথার্থই আমি গাধা—যথার্থই আমি মনুষ্য নামের অযোগ্য। তা যদি না হ'বে, তাহ'লে আজ আমার কুললক্ষ্মীর উপর এত অত্যাচার ঘট্‌তে পারে—আমার সোণার প্রতিমা আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়? আমি নরাধম।

অমনি বোস-গৃহিণী শৈবলিনীর শয্যাত্যাগ করিয়া ভূতলে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধ নফরচন্দ্রকে প্রণাম করিল, তাহার পর, নতমস্তকে বলিল, আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনার ন্যায় মহাপুরুষকে আমি ছোট মুখে বড় কথা বলেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

নফরচন্দ্র আবেগভরে বলিল, সত্য কথাই বলেছ মা! তাতে কোন অপরাধ হয়নি। আমি পুরুষ—সুবিখ্যাত ঘোষবংশের কর্ত্তা হ'য়ে একটা হীন বংশের স্ত্রীলোকের মোহে এত মুগ্ধ হ'য়ে এতকাল পড়েছিলাম যে পিতৃকুলের মান-মর্য্যাদা হারাতে বসেছি—বড় ঘরের বড় মুখে চুণকালি দিয়েছি—অভিমানের খড়্গে কুললক্ষ্মীকে বলিদান দিতে বসেছি। আমার মত এত বড় মহাপাপী এ সংসারে কে আছে?

আগুনের হল্‌কার মত হরসুন্দরী কক্ষ-মধ্যে ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধ নফরচন্দ্রের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, আমি হীনবংশের স্ত্রীলোক?



আজ বৃদ্ধের মোহ ঘুচিয়া গিয়াছে—বড় ঘরের পৌরুষ বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। অমনি নফরচন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে হরসুন্দরীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, চোখ রাঙ্গায়োনা ঘোষ-গিন্নি! বড় ঘরের বড় মর্য্যাদার দায়ীত্ব একদিন তোমার হস্তে সমর্পণ করে' আফিংএর নেশায় ঝিম্ হ'য়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছিলাম। তুমি যদি বড় বংশের মেয়ে হ'তে, তাহ'লে আজ কি আমার মাথাটা এমন করে' নীচু করে' দিতে পার্‌তে? তুচ্ছ একটা পূজার তত্ত্ব—দু' পাঁচশ টাকা যার মূল্য, তারই জন্ম আমার কি অমূল্য সম্পত্তি নষ্ট করেছ, তুমি কি বুঝ্‌বে ছোটলোকের মেয়ে? রাগে বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

লগুড়াঘাতে কালসর্পিনীর কোটী ভঙ্গ হইলে সে যেমন উর্দ্ধফণা হইয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, বিষ উদ্গীরণ করিবার জন্ম যেমন অবিরাম মাথা দোলাইতে থাকে, হরসুন্দরী তেমনিভাবে বৃদ্ধের মুখের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, অত্যন্ত ক্রোধে তাহার মুখ হইতে একবর্ণও উচ্চারিত হইল না।

হরসুন্দরীর আজ কি অপমান—কি লাঞ্ছনা! পরম শত্রু বোস-গিন্নীর সম্মুখেই তাহাকে তাহার বৃদ্ধ স্বামী এমনভাবে অপমানিত করিল। ঘৃণা—অভিমান—ক্রোধ তাহার উচ্চ বক্ষস্থল আজ যেন লৌহের মুদ্গরের আঘাতে গুঁড়াইয়া চূর্ণ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরসুন্দরী বলিল, আমি যদি ছোটলোকের মেয়ে হই, তোমার সংসারে আগুন জ্বেলে দিয়ে যাব।

নফরচন্দ্র বলিল, আগুন ত তুমি অনেককাল জ্বেলে দিয়েছ? ঘরে এসেই পরম মিত্র বোসেদের সঙ্গে বিবাদ করে' শত্রু করে' তুলেছ—বড় ছেলেটাকে গৃহত্যাগী করেছ—ছোট ছেলেটাকে সন্ন্যাসী করে' ছাড়্ছো—আদরের একটা মেয়ে, তার সঙ্গেও বিবাদ বাধায়েছ। সর্ব্বনাশি! আর কি কর্‌তে চাও?

হরসুন্দরী জ্ঞান হারাইল—উন্মাদিনীর ন্যায় সে বৃদ্ধের অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইল। ব্যাপার দেখিয়া বোস-গিন্নী আর নীরবে থাকিতে পারিল না—ছুটিয়া গিয়া উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া হরসুন্দরীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ঘোষ-গিন্নি! কর কি? স্বামীর গায়ে হাত তুল্‌ছো? পাপের আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। ছিঃ! ছিঃ! বলিয়াই বোস-গিন্নী তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া গৃহের বাহির করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়ে শৈবলিনী চৈতন্য লাভ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, মা! মা!

বোস-গিন্নী ছুটিয়া গিয়া শয্যার উপর উঠিয়া শৈবলিনীকে বুকে টানিয়া ধরিল, তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, কি মা!

শৈবলিনী বলিল, আর কেউ আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না মা?

অমনি নফরচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া শৈবলিনীর বুকের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, বল্‌বো মা! আমি বল্‌বো। মা আমার?

শৈবলিনী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, বাবা!

মুখের উপর মুখ রাখিয়া নফরচন্দ্র বলিল, কি মা? বৃদ্ধ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

ঊষারাণী ছুটিয়া আসিয়া পিতার পাশে বসিয়া শৈবলিনীর হাত ধরিয়া বলিল, বউদিদি! আইন অমান্য হ'য়ে গেছে—কথা বল্‌তে ছুটে এসেছি। আমাকে ক্ষমা কর বউদিদি! বলিয়াই সে শৈবলিনীর বুকের উপর মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর, একে একে সকলেই আসিয়া শৈবলিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল—আসিল না কেবল বড় ঘরের বড় গিন্নী হরসুন্দরী। সকলেই বুঝিয়াছিল, আর কেন, দুদণ্ড পরে শৈবলিনীর জীবন-লীলা সাঙ্গ হ'য়ে যাবে।

---

(৩২)

আজ হরসুন্দরীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তাহার এত অহঙ্কার—এত আধিপত্য সব নষ্ট হইয়া গেল—তাহার আত্মাভিমানে প্রবল আঘাত পড়িল। ঘোষ-পরিবারে এতকাল সকলে নতমস্তকে তাহার আদেশ পালন করিয়াছে—এত বড সংসারটা তাহার ইঙ্গিতে চালিত হইয়াছে—পুরবাসী পরিজনেরা তাহার কথায় উঠিয়াছে বসিয়াছে কিন্তু আজ তাহার সব প্রভুত্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহার বলে বল—যাহার আদরে এ আধিপত্য—যাহার প্রশ্রয়ে সে এ যাবৎ সকলকেই পদানত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার সেই স্বামী আজ তাহাকে কটূক্তি করিয়াছে—দশ জনের সম্মুখে হতমান করিয়াছে। হরসুন্দরীর বুক ফাটিয়া গেল—চোখে জল আসিল—সে ছুটিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

সমস্ত দিন হরসুন্দরী উঠিল না—স্নান আহার করিল না কিন্তু কেহই আজ তাহার কাছে আসিল না—সাধ্য সাধনা করিল না—মুখের কথাটী পর্য্যন্ত কেহ তাহার সঙ্গে কহিল না। সংসারের সমস্ত লোকের ক্রোধ তাহার উপরে। স্বামী বিরক্ত হইয়াছে—সন্তানেরা শ্রদ্ধা

হারাইয়াছে—আত্মীয় স্বজনেরা শতমুখে তাহার নিন্দা করিতেছে—দাস দাসীরা পর্য্যন্ত যেন ঘৃণাভরে তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে। লজ্জায় ঘৃণায় হরসুন্দরীর মরিতে ইচ্ছা হইল।

দুনিয়ার সমস্ত লোক যখন তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছে—যে স্বামী এতকাল তাহার কথায় উঠিত বসিত—তাহার উপরই সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছিল, সেই স্বামী যখন তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছে—পেটের সন্তানেরাও যখন তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন হরসুন্দরী বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, যথার্থই তাহার অপরাধ ঘটিয়াছে—একটা নিরপরাধ বালিকার উপর অযথা অত্যাচার করিয়া তাহাকে মরণের পথে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে—তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একজোটে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। এতদিনের পর তাহার হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল।

কিন্তু আর যে প্রতিকারের উপায় নাই! তাহার মুখ দেখাইবার পথ নাই। হরসুন্দরী হৃদয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। সে নিজের কক্ষে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল—অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটাইতে লাগিল। স্নান আহারের জন্য দাস দাসীরা এক আধবার অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু হরসুন্দরী তাহাদের ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিল—তাহারা মুখ বিকৃত করিয়া প্রস্থান করিল।

কয়দিন কাটিয়া গেল—বৃদ্ধ নফরচন্দ্র আর তাহার কাছে আসিল না—একটা সান্ত্বনার কথাও বলিল না—বধূমাতার চিকীৎসার জন্য তাহার কক্ষেই দিন কাটাইতে লাগিল। কর্ত্তার এ প্রকার অবজ্ঞা হরসুন্দরীর অন্তরে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করিল। তখন সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, নূতন বউএর মরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও এ পৃথিবী

ত্যাগ করিতে হইবে। একটা পরের মেয়েকে যে জ্বালা দিয়া মারিয়াছে, নরকে গিয়া তাহার শত গুণ শাস্তি গ্রহণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

নূতন বউএর চিকীৎসার জন্য সকলে ব্যস্ত—হরসুন্দরীর দিকে লক্ষ্য করিবার মত মন তখন কাহারও ছিল না। অবসর মত কন্যা উষারাণী বড় বধূ সুরমা তাহার কাছে গিয়াছে কিন্তু হরসুন্দরী কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহে নাই, শুদ্ধ শয্যায় শয়ন করিয়া জানাইয়াছে, আমার শরীর ভাল নয়, তোমরা চলিয়া যাও।

সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া হরসুন্দরী শয়ন করিয়াছিল। পুত্র প্রকাশ-চন্দ্র ধীরপদে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া জননীর পদতলে বসিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিল, মা!

চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া হরসুন্দরী দেখিল, প্রকাশচন্দ্র তাহাব পদতলে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। হরসুন্দরী বলিল, পা ছাড় প্রকাশ! আাম তোদেব মা নই—আমি রাক্ষসী। একটা কচি বউএর মাথা চিবিয়ে খেয়েছি—তোরা সরে যা—হয়ত ক্ষিধের জ্বালায় আমি টপ্ টপ্ করে' সব গিলে ফেলবো।

প্রকাশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কেন এমন অধীর হচ্ছ মা! পরের মেয়েটার কাছে একবাব এস—তার পাশে বস—চিরদিনের মত তাকে বিদায় দাও।

হরসুন্দরী মাথা তুলিয়া বলিল, সেই দেবকন্যার পাশে গিয়ে বস্‌বার অধিকার আমার আছে প্রকাশ?

প্রকাশ বলিল, তোমার কি অপরাধ মা? সে যে নিজের দোষে নিজে মরেছে।

হরসুন্দরী বলিল, নিজের দোষে মরছে? মিথ্যে কথা বলিসনে প্রকাশ! আমিই তাকে হত্যা করেছি—বড় ঘরের মানের দাবীতে আমি একটা পরের মেয়ে বলিদান করেছি। এ পাপের শাস্তি আমি নিজে গ্রহণ করবো।

চমকিত হইয়া প্রকাশ বলিল, কি করবে তুমি মা?

হরসুন্দরী বলিল, তাকে যন্ত্রণা দিয়েছি—সেই অভিমানে সে অনাহারে অনিদ্রায় মরণের পথে ছুটে চলেছে। আমিও তার প্রায়শ্চিত্ত করবো, অনাহারে অনিদ্রায় আমিও এ পাপদেহ ত্যাগ করবো।

অমনি প্রকাশ জননীর পা জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে উঠাইতে পারিল না—তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইতে পারিল না। যুবক বুঝিল, ঘোষ পরিবারের ধ্বংসই ইহার অনিবার্য্য পরিনাম। সে ধীরপদে জননীর কক্ষত্যাগ করিল।

---

(৩৩)

হরসুন্দরীর কঠোর আদেশ অগ্রাহ্য হইয়া গেল—বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আজ প্রাণপণে শৈবলিনীর সেবা করিতে লাগিল। বোস-গিন্নী শৈবলিনীর শিয়রে বসিয়া অনাহারে অনিদ্রায় তাহার সেবা করিতে লাগিল! বৃদ্ধ নফরচন্দ্র তাহার ধনের সিন্ধুক উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত হস্তে অজস্র অর্থবৃষ্টি করিতে লাগিল। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আসিতে লাগিল—মূল্যবান ঔষধ পথ্যে ঘর ভরিয়া গেল। চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি রহিল না কিন্তু সব বিফল হইয়া গেল—দিন দিন শৈবলিনীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

আগুন যখন মটুকায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন আর জল ঢালিয়া ফল কি হইবে? ডাক্তারেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন রোগের বিন্দুমাত্র উপশম করিতে পারিল না, তখন তাহারা হতাশ হইয়া জবাব দিয়া একে একে প্রস্থান করিতে লাগিল। বৃদ্ধ নফরচন্দ্র তখন পাগলের মত হইল—যাহার তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, আমার ধন-

সম্পত্তি যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে তোমরা আমার বউমার জীবন রক্ষা কর। হায় অভাগা! যদি দুদিন আগে চৈতন্য হইত, তাহা হইলে আজ এত অর্থ অপব্যয় হইত না—তোমার কুললক্ষ্মী এমনিভাবে অত্যাচারের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত না।

শৈবলিনী অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, মা!

আগ্রহভরে মাথা নীচু করিয়া মহামায়া বলিল, কি মা!

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল, বাঁচ্তে বড় সাধ হচ্ছে মা!

বুকভরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া মহামায়া বলিল, এত চেষ্টা করেও ত তোমাকে রক্ষা করতে পার্লাম না মা?

আবার কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া শৈবলিনী বলিল, তিনি কোথায়?

শৈবলিনী প্রকাশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াছিল, সকলেই বুঝিতে পারিল। প্রকাশ তখন শৈবলিনীর পার্শ্বে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতেছিল। শৈবলিনীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া প্রকাশ বলিল, এই যে আমি!

শৈবলিনী বলিল, কথা বল্তে হুকুম পেয়েছ? ও কি! তুমি কাঁদ্ছো? কেঁদোনা। তুমি একটুখানি হাস—তোমার মুখের হাসি দেখে আমি সুখে মর্তে পার্বো।

প্রকাশ মাথা নীচু করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শৈবলিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহামায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, বাবাকে, ভাই বোন্দের দেখ্তে সাধ হয়েছে মা! বলিয়াই শৈবলিনী অচৈতন্য হইল।

ঠিক সেই সময়ে নফরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুকূলচন্দ্রের সহিত হেমবাবু পুত্র-কন্যাদের হাত ধরিয়া উন্মাদের মত কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাদের দেখিয়া সকলেই শৈবলিনীর শয্যা ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। হেমবাবু গভীর শোকভরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, বেহাই! বেহাই! আমার মা কই? হেমবাবু শয্যার উপর উঠিয়া শৈবলিনীর লুণ্ঠিত মস্তক অঙ্কে তুলিয়া লইলেন—ভাই ভগিনীগুলি শৈবলিনীর বুকের উপর মুখ রাখিয়া দিদি! দিদি! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

অমনি শৈবলিনীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—পিতাকে দেখিয়া ভাই ভগিনী-দের দেখিয়া তাহার মলিন মুখখানি যেন পরমানন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—মুখে হাস্তের রেখা ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণ হস্ত অতি কষ্টে উত্তোলন করিয়া শৈবলিনী ভাই ভগিনীদের বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিল—তাহার দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারায় আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। হেমবাবু শৈবলিনীর মুখের উপর মুখ রাখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, মা! মা! অনুকূলের টেলিগ্রাম পেয়েই চাকরীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাকে দেখ্‌তে ছুটে এসেছি। কথা কও মা!

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে শৈবলিনী বলিল, বাবা! এসেছ—পূজার তত্ত্ব এনেছ? বড় ঘরের মান রক্ষা করেছ?

ঠিক সেই সময়ে প্রকাণ্ড একটা ভার কাঁধের উপর করিয়া শঙ্কর চাকর দ্রুতপদে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, এনেছি—এনেছি দিদি! শঙ্কর চাকরের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে' সহর উজাড় করে' বাছা বাছা জিনিস্ এনেছি—চোখের উপর দেখ, বড় ঘরের মান রক্ষা কেমন করে' করেছি।

শঙ্কর মস্তকের ভার কক্ষতলে নামাইল—আরও কয়েক জন ভারীর স্কন্ধে প্রচুর দ্রব্য উপস্থিত লইল—ঘর ভরিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া শঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

শঙ্করের উন্মাদের মত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের অন্তরে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। হেমবাবু পর্য্যন্ত ভীতভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অমনি বোস-গিন্নী উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, ওগো বড় ঘরের বড় গিন্নি! ওগো বাঙ্গালীর ঘরের শাশুড়ী! একবার ছুটে এস—চোখে দেখে যাও। একটা চাকরের বুকে কি মায়া-মমতা—কি কৃতজ্ঞতা—কি উদারতা! বধূ-নির্য্যাতনের মহাপাপে বাঙ্গালা দেশ আজ শ্মশান হয়েছে—সব ধ্বংসের পথে চলেছে। আর সহ্য কর্‌তে পারিনে। বলিয়াই মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষত্যাগ করিল।

---

(৩৪)

চোখের উপর এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই অনুকূল-চন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়া শ্যামবাজারে তাহার শ্বশুরালয়ে গিয়া আশ্রয় লইয়া-ছিল। জননীর সহিত যখনই তাহার বিবাদ উপস্থিত হইত, তখনই সে রাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইত। সেইজন্য হরসুন্দরী মন্তব্য প্রকাশ করিত, তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ীই তাহার মাথা খাইতেছে। অনুকূলের শ্বশুর শ্বাশুড়ী সে মন্তব্যে কর্ণপাত করিত না, কেননা, তাহারাও বড়লোক—জমিদার।

অনুকূল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া সঙ্গোপনে বাড়ীর সংবাদ লইত। শৈবলিনীর কঠিন রোগের কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল—জনক-জননীর উপর তাহার বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। সে কালবিলম্ব না করিয়া সিমলার পাহাড়ে হেমবাবুকে টেলিগ্রাম করিয়া বিপদের কথা জানাইল। শৈবলিনীর জীবন-সঙ্কট অবস্থা শ্রবণ করিয়া হেমবাবুর মাথায়

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পূজার তত্ত্ব হয় নাই বলিয়া মার উপর অত্যাচার হইয়াছে, মা আমার মরিতে বসিয়াছে, হেমবাবু যখন শঙ্কর চাকরকে এ সংবাদ জানাইলেন, তখন শঙ্কর উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কি! পূজার তত্ত্ব হয়নি বলে' তারা আমার দিদিমণিকে মেরে ফেলছে? বাবু! বাবু! আমি এখনই কলিকাতায় যাব—পূজার তত্ত্ব তাদের কড়ায় গণ্ডায় বুঝে দেব—সে সয়তানদের হাত থেকে আমার দিদিমণিকে রক্ষা করবো।

হেমবাবু চাকরীর মমতা রাখিলেন না—আফিসে একটা দরখাস্ত পর্য্যন্তও করিলেন না—তখনই শঙ্কর চাকর ও পুত্র কন্যাদের লইয়া কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যথাসময়ে কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমেই শ্যামবাজারে অনুকূলচন্দ্রের শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। হাবড়ার ষ্টেশন হইতেই শঙ্কর চাকর সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হেমবাবু শঙ্করকে চিনিতেন। সে যে শৈবলিনীকে কত ভালবাসে ভালরূপ জানিতেন। তিনি ভাবিলেন, হতভাগা শঙ্কর হয়ত পাগল হইয়া গিয়াছে।

শঙ্করের নিকট এখনও সাত আটশত মুদ্রা সঞ্চিত ছিল। সে ভবানীপুরে একজন পরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে পূজার তত্ত্বের বাজার করিল, তাহার পর, নিজে মোট মাথায় করিয়া ভারীর স্কন্ধে ভার তুলিয়া দিয়া পটলডাঙ্গার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

• • • • • • •

শঙ্কর উন্মাদের ন্যায় উচ্চহাস্য করিয়া হরসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, কোথায় গেলে গো ঘোষ-গিন্নি! ছুটে এস—পূজার তত্ত্ব

বুঝে নাও—বড় ঘরের মান রক্ষা হ'ল কি না একবার চোখে দেখে যাও। যথার্থই তখন হরসুন্দরী নিজের কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—উঁকি দিয়া ঘরের দিকে চাহিতেছিল—পূজার তত্ত্ব চোখে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে ক্ষীণকণ্ঠে শৈবলিনী বলিল, শঙ্কর দা!

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শঙ্কর উত্তর প্রদান করিল, কেন দিদি!

শৈবলিনী বলিল, যাই আমি।

শঙ্কর বলিল, কেন যাবে? মনে পড়ে দিদি! সেদিনকার কথা? তুমি বলেছিলে, আমার বাবাকে যত্ন করো। বসে আছেন তোমার পিতা, জিজ্ঞাসা কর তাঁকে, যত্নের কোন ত্রুটি হয়েছিল কি? বলেছিলে দিদি। আমার ভাই বোন্‌দের মেরো না, জিজ্ঞাসা কর তাদের—শঙ্করের একটা নখের আঁচড়ও কি তাদের গায়ে লেগেছিল? তাদের ভালবাস্‌তে বলেছিলে। আমি ছোটলোকের ছেলে—বড় ঘরের লোকে কি করে' ভালবাসে, আমি জানিনে দিদি! তবে আমি ছোটলোক, তোমার ভাই বোন্‌গুলিকে দিনরাত্রি বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছিলাম—তাদের শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে' ছিলাম। এর চেয়ে ত বেশী ভালবাস্‌তে আমি ছোটলোক শিক্ষা করিনি দিদি। তারপর, পূজার তত্ত্ব? শঙ্করের ভাণ্ডার উজাড় করে' তত্ত্ব এনেছে— চোখে দেখ দিদি। তবে কেন আজ আমাদের ত্যাগ করে' চলে যাবে?

শোকের ঝড়ের দমকা বাতাসে সমগ্র সংসার যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। হরসুন্দরী দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—অনাহারে অনিদ্রায় আজ তাহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—সে কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। আজ পাষাণ হিমাচল গলিয়া গেল—হরসুন্দরীর চক্ষেও অশ্রুধারা ঝরিয়া

পড়িল। অমনি ঘোস-গিন্নী উন্মাদিনীর ন্যায় কক্ষ-মধ্যে ছুটিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, বড় ঘরের মান রক্ষা হয়েছে—আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। কোথায় গেলে বোস-গিন্নি! আমি আজ নিজের মুখেই স্বীকার করছি, যথার্থ ই আমি ছোট—অতি ছোট—তোমার পায়ের ধুলোরও যোগ্য নই। বউমা। বউমা! ক্ষমা কর—ছেড়ে যেয়ো না—এত বড় ঘোষ-বংশ ছারখার করে দিয়ো না। তার চেয়ে, অভিসম্পাত কর মা—আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ক। বলিয়াই হরসুন্দরী শৈবলিনার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

অমনি শৈবলিনীর মুখে শেষ বাণী উচ্চারিত হইল —মা!

সম্পূর্ণ।